রক্তকরবী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
No. lmp. 4065
DATE 7/9/09
CALCUTTA

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়

২১৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়

প্রথম সংস্করণ—১৩৩৩ সাল

মূল্য—১৸০ এক টাকা বার আনা

শান্তিনিকেতন প্রেসে

রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

প্রস্তাবনা

আজ আপনাদের বারোয়ারী সভায় আমার "নন্দিনী"র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হ'য়েছে। ভয় হ'চ্ছে, পালা সাঙ্গ হ'লে ভিখ মিল্‌বে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট ক'র্‌তে পার্‌বে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর-থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন। আমার নিবেদন, (যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য ক'র্‌লেই তার সার্থকতা চ'লে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে তার কার্য্য-প্রণালী তদারক ক'র্‌তে গেলে কাজ বন্ধ হ'য়ে যাবে।) দশমুণ্ড বিশহাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর ল্যাজে ক'রে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত ক'র্‌তেন তা হ'লে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলরব উঠ্‌তো। সন্দেহ ক'র্‌তেন কোনো একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হ'চ্ছে। অথচ শত শত বছর ধ'রে স্বভাব-সন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ ক'রে এলেন—গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধ'রে টানাটানি ক'র্‌লেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হ'লো না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। (বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন,

গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদ-দ্বারে শৃঙ্খলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় ক'র্‌তো। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাক্‌তে পার্‌তো। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অম্‌নি ধর্ম্ম জেগে উঠ্‌লেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত ক'র্‌লেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটেনি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘট্‌বে এমনও একটা সূচনা আছে।

আদি কবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিলো না এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হ'য়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্ত্তমান প্রতিনিধিটি একদেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক ব'লে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে শুন্‌বেন তাঁরা জান্‌বেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠ'ক্‌বেন। এইটুকু ব'ল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনা-স্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা-যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কতো কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবি-গুরু যে সেই অনির্দ্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দ্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌তো তা হ'লে ল্যাজের আগুনে ভস্ম না হ'য়ে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তো।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনা-স্থানের একটি ডাক-নাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী ব'লে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণ-সিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুরঙ্গ-খোদাই ক'রে সেই ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর

ক'রে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা লক্ষীপুরী বলে। যক্ষপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখ্‌ছি তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকৃতে হরণ ক'রেছেন। যদি বলো প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিলো কেউ তা মান্‌বে না। এটা-যে বর্ত্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় ত'াব হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হ'য়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি রকম কৌশলে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তেন তার আব-একটি প্রমাণ দেবো।

(কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এসম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ ক'রে থাকি। কৃষি-কাজ থেকে হরণেব কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষি-পল্লীকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্ছে। তা ছাড়া, শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বেষ-হিংসা বিলাস বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।) আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁব রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ ক'রেছেন সেটা প্রণিধান ক'র্‌লেই বোঝা যায়। নব-দুর্ব্বা-দল-শ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষ-সংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ ক'রে নিয়েছিলো সেটা কি সেকালের কথা, না একালেব? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমাব মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নব-দুর্ব্বাদল-বিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিলো?

আরো একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছে ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে ব'ল্‌বার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা প'ড়্‌ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চট্‌কলে ম'র্‌তে আস্‌বে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এসমস্তই পরবর্ত্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।

বারোয়ারীর প্রবীণ মণ্ডলীর কাছে একথা ব'লে ভালো ক'র্‌লেম না।

সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথাসম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান্ ব'লেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ ব'ল্‌তে পারিনে, বিধাতা তাঁদের এই রকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কৌতুক ক'র্‌বার জন্যেই। পুণ্যশ্লোক বাল্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ ক'র্‌লুম ব'লে পুনর্ব্বার হয়তো তাঁরা আমাকে এক-ঘরে ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন। ভরসার কথা আমার দলের লোক আছেন, কৃত্তিবাস নামে আর এক বাঙালী কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠলো। আধুনিক সমস্যা ব'লে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তারপরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হ'লেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আশীর্ব্বাদে তাঁর বীণা বাজ্‌লো। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হ'লেন তখনই আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিলো।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রামরাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হ'লো আরাম, শান্তি; রাবণ হ'লো চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য্য, পল্লবের মর্ম্মর, আর-একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শব্দধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখবিরহমিলন ভালো-মন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল ক'রে ধ'র্‌বার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পট-ভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণীগত মানুষের। রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের, আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হ'লে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভু'লে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের

ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। (ফোয়ারা যেমন সঙ্কীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে তেম্‌নি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ ক'রে তাকিয়ে দেখেন তা হ'লে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন) নয় তো রক্তকরবীর পাপ্‌ড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজ্‌তে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হ'লে তার দায় কবির নয়। (নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি-খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়; মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্য্যের।)

রক্তকরবী

[এই নাট্য-ব্যাপার যে-নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।]

নন্দিনী ও কিশোর (সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক)

কিশোর

নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!

নন্দিনী

আমাকে এতো ক'রে ডাকিস্ কেন, কিশোর? আমি কি শুন্‌তে পাইনে!

কিশোর

শুন্‌তে পা'স্ জানি, কিন্তু আমার যে ডাক্‌তে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হ'লে আন্‌তে যাই।

নন্দিনী

যা, যা, এখনি কাজে ফিরে' যা, দেরি করিস্‌নে।

কিশোর

সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে' আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি ক'রে তোর জন্যে ফুল খুঁজে' আন্‌তে পার্‌লে বেঁচে যাই।

নন্দিনী

ওরে কিশোর, জান্‌তে পার্‌লে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর

তুমি যে ব'লেছিলে—রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে-পেতে একজায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী

আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে' আন্‌বো।

কিশোর

অমন কথা ব'লো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হ'য়ো না। ঐ গাছটি থাক্, আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাবো, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী

কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়!

কিশোর

সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশী ক'রে আমারই হ'য়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী

কিন্তু তোদের এ-দুঃখ আমি সইবো কি ক'রে?

কিশোর

কিসের দুঃখ? একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেবো, নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে-মনে ভাবি।

নন্দিনী

তুই তো আমাকে এতো দিলি, তোকে আমি কি ফিরিয়ে' দেবো, বল্‌তো কিশোর?

কিশোর

এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী

আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সাম্‌লে চলিস্।

কিশোর

না, আমি সাম্‌লে চ'ল্‌বো না, চ'ল্‌বো না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেবো।

[প্রস্থান]

[অধ্যাপকের প্রবেশ]

অধ্যাপক

নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে' চাও।

নন্দিনী

কি অধ্যাপক!

অধ্যাপক

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক্ লাগিয়ে' দিয়ে চ'লে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে! একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দর্‌কার?

অধ্যাপক

দর্‌কারের কথা যদি ব'ল্‌লে ঐ চেয়ে দেখো! আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে' দর্‌কারের বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে উপরে উঠে' আস্‌ছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধূলোর নাড়ীর ধন,—সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধূলোর নয়, সে যে আলোর। দর্‌কারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধ্‌বে?

নন্দিনী

বারে-বারে ঐ একই কথা বলো। আমাকে দেখে' তোমার এতো বিস্ময় কিসের অধ্যাপক?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তা'তে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো! তুমিই বা এখানকার কথা কি ভাব্‌ছো বলো দেখি?

নন্দিনী

অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছি সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে' তোমরা যক্ষের ধন বের ক'রে ক'রে আন্‌ছো। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিলো।

অধ্যাপক

আমরা যে সেই মরা ধনের শব-সাধনা করি। তার প্রেতকে বশ ক'র্‌তে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধ্‌তে পার্‌লে পৃথিবীকে পাবো মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী

তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত

জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছো, সে যে মানুষ, পাছে সে-কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে' ফেলে' তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেম্‌নি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে' ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক

আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ঙ্কর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেম্‌নি ভয়ঙ্কর প্রতাপ।

নন্দিনী

এ-সব তোমাদের বানিয়ে'-তোলা কথা।

অধ্যাপক

বানিয়ে'-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে'-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখারী। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে' দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী

তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে' খুদে' মাটির মধ্যে তলিয়ে' চ'লেছে, তুমিও তেম্‌নি দিন-রাত পুঁথির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়ে'ই চ'লেছো। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে-খরচ ক'র্‌বে কেন?

অধ্যাপক

আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্ত্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে' আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যা-তারাটি, তোমাকে দেখে' আমাদের ডানা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট ক'র্‌তে দাও।

নন্দিনী

না, না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখ্‌বো।

অধ্যাপক

সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে দেবে না।

নন্দিনী

আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে।

অধ্যাপক

জানো নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ঙ্কর, আমিও তেম্‌নি ভয়ঙ্কর পণ্ডিত।

নন্দিনী

আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্‌ছো তুমি। তোমাকে তো ভয়ঙ্কর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এলো, রঞ্জনকে সঙ্গে আন্‌লে না কেন?

অধ্যাপক

সব জিনিষকে টুক্‌রো ক'রে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা-ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আন্‌তে চাও?

নন্দিনী

আমার রঞ্জনকে এখানে আন্‌লে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠ্‌বে।

অধ্যাপক

একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দ্দাররা হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছে, রঞ্জনকে আন্‌লে তাদের হবে কি?

নন্দিনী

ওরা জানে না ওরা কি অদ্ভুত! ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তা হ'লেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক

দেবতার হাসি সূর্য্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না; আমাদের সর্দ্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী-নদীর মতো। ঐ নদীর মতোই সে যেমন হাস্‌তেও পারে তেম্‌নি ভাঙ্‌তেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক

জান্‌লে কি ক'রে?

নন্দিনী

হবে, হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক

সর্দ্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আস্‌বে?

নন্দিনী

যে-পথে বসন্ত আস্‌বার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক

তার মানে আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে!

নন্দিনী

যখন রঞ্জন আস্‌বে তখন দেখিয়ে দেবো উড়ো খবর কেমন ক'রে মাটিতে এসে পৌঁছলো।

অধ্যাপক

রঞ্জনের কথা উঠ্‌লে নন্দিনীর মুখ আর থাম্‌তে চায় না। থাক্‌গে, আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ব-বিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে

ঢুকে' পড়িগে, আর সাহস হ'চ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে' এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় ক'র্‌ছে না?

নন্দিনী

ভয় ক'র্‌বে কেন?

অধ্যাপক

গ্রহণের সূর্য্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্য্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা পুরী। সোনার গর্ত্তের রাহুতে ওকে খাব্‌লে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখ্‌তে চায় না। আমি তোমাকে ব'ল্‌ছি, এখানে থেকো না। তুমি চ'লে গেলে ঐ গর্ত্তগুলো আমাদের সাম্‌নে আবো হাঁ ক'রে উঠ্‌বে, তবু ব'ল্‌ছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি ক'রে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকোগে। (কিছু দূর গিয়ে ফিরে' এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ঐ যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে?

নন্দিনী

কেন, কি ক'র্‌বে তুমি?

অধ্যাপক

কতোবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পরো, তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী

আমি তো জানিনে কি মানে?

অধ্যাপক

হয় তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। ঐ রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য্য নয়!

নন্দিনী

আমার মধ্যে ভয় ?

অধ্যাপক

সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানিনে, রাঙা রঙে তুমি কি লিখন লিখ্‌তে এসেছো। মালতী ছিলো, মল্লিকা ছিলো চামেলি ছিলো, সব বাদ দিয়ে এ-ফুল কেন বেছে নিলে ? জানো, মানুষ না জেনে অম্‌নি ক'রে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়।

নন্দিনী

রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী। জানিনে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ্‌ রাঙা, সেই রং গলায় প'রেছি, বুকে প'রেছি, হাতে প'রেছি।

অধ্যাপক

তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝ্‌বার চেষ্টা করি।

নন্দিনী

এই নাও। আজ রঞ্জন আস্‌বে সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।

[অধ্যাপকের প্রস্থান

[সুড়ঙ্গ খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল

একবার মুখ ফেরাও তো দেখি। তোমাকে বুঝ্‌তেই পার্‌লুম না। তুমি কে ?

নন্দিনী

আমাকে যা দেখ্‌ছো তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝ্‌বার তোমার দর্‌কার কি ?

গোকুল

না বুঝ্‌লে ভালো ঠেকে না ? এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে ?

নন্দিনী

অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল

একটা কি মন্তর তোমার আছে! ফাঁদে ফেল্‌ছো সবাইকে। সর্ব্বনাশী তুমি! তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে' যারা ভুল্‌বে তারা ম'র্‌বে। দেখি, দেখি, সীঁথিতে তোমার ঐ কি ঝুল্‌ছে ?

নন্দিনী

রক্তকরবীর মঞ্জরী।

গোকুল

ওর মানে কি ?

নন্দিনী

ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল

আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করিনে। একটা কি ফন্দী ক'রেছো। আজ দিন না যেতেই একটা কিছু বিপদ্ ঘটাবে। তাই এতো সাজ। ভয়ঙ্করী, ওরে ভয়ঙ্করী!

নন্দিনী

আমাকে দেখে' তোমার এমন ভয়ঙ্কর মনে হ'চ্ছে কেন ?

গোকুল

দেখে' মনে হ'চ্ছে তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই নির্ব্বোধদের বুঝিয়ে' বলিগে, "সাবধান, সাবধান, সাবধান!"

[প্রস্থান

নন্দিনী

[জালের দরজায় ঘা দিয়ে ।

শুন্‌তে পাচ্ছো ?

নেপথ্যে

নন্দা, শুন্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী

আজ খুশীতে আমার মন ভ'রে আছে। সেই খুশী নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে না, যা ব'ল্‌তে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী

কুঁদ-ফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে

নিজে পরো।

নন্দিনী

আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে

আমি পর্ব্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী

সেই চূড়ার বুকেও ঝরনা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা তুলবে। জাল খুলে' দাও, ভিতরে যাবো।

নেপথ্যে

আস্‌তে দেবো না, কি ব'লবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী

দূর থেকে ঐ গান শুন্‌তে পা'চ্ছো ?

নেপথ্যে

কিসের গান ?

নন্দিনী

পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাট্‌তে হবে, তারি ডাক।

(গান)

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চ'লে,
আয়, আয়, আয় !
ডালা যে তার ভ'রেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায়, হায়, হায় !

দেখ্‌ছো না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে' দিচ্ছে।

হাওয়ার নেশায় উঠ্‌লো মেতে
দিগ্‌-বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায়, হায়, হায় !

তুমিও বেরিয়ে এসো, রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে' শুনে' আকাশ খুসি হ'লো,
ঘরেতে আজ কে রবে গো ? খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে

আমি মাঠে যাবো ? কোন্ কাজে লাগ্‌বো ?

নন্দিনী

মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ !

নেপথ্যে

সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝর্‌নার মতো নাচ্‌তে পারে ? যাও, যাও, আর কথা ক'য়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী

অদ্ভুত তোমাব শক্তি। যেদিন আমাকে তোমাব ভাণ্ডারে ঢুক্‌তে দিয়েছিলে, তোমাব সোনাব তাল দেখে' কিছু আশ্চর্য্য হইনি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনাযাসে সেইগুলোকে নিয়ে চূড়ো ক'বে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে' মুগ্ধ হ'য়েছিলুম। তবু বলি, সোনাব পিণ্ড কি তোমাব ঐ হাতেব আশ্চর্য্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পাবে ধানেব ক্ষেত? আচ্ছা, বাজা, বলো তো, পৃথিবীব এই মবা-ধন দিন-বাত নাড়াচাড়া ক'ব্‌তে তোমাব ভয় হয না?

নেপথ্যে

কেন, ভয় কিসেব?

নন্দিনী

পৃথিবী আপনাব প্রাণেব জিনিস আপনি খুশী হ'য়ে দেয়। কিন্তু যখন তাব বুক চিবে' মবা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য্য ব'লে ছিনিয়ে' নিয়ে আসো, তখন অন্ধকাব থেকে একটা কাণা বাক্ষসেব অভিসম্পাত নিয়ে আসো। দেখ্‌ছো না এখানে সবাই যেন কেমন বেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ ক'ব্‌ছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে?

নেপথ্যে

অভিসম্পাত?

নন্দিনী

হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়িব অভিসম্পাত।

নেপথ্যে

শাপেব কথা জানিনে। এ জানি যে আমবা শক্তি নিয়ে আসি। আমাব শক্তিতে তুমি খুশী হও, নন্দিনী?

নন্দিনী

ভাবি খুশী লাগে। তাই তো ব'ল্‌ছি আলোতে বেবিয়ে' এসো, মাটিব উপব পা দাও, পৃথিবী খুশী হ'য়ে উঠুক্‌।

আলোর খুশী উঠ্‌লো জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুশী ধরে না গো ঐ যে উথলে,
মরি, হায়, হায়, হায়!

নেপথ্যে

নন্দিনী, তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে' তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধ'র্‌তে পার্‌ছিনে। আমি তোমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখ্‌তে চাই, না পারি তো ভেঙে-চূরে' ফেল্‌তে চাই।

নন্দিনী

ও কি ব'ল্‌ছো তুমি?

নেপথ্যে

তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে-নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন ক'রে প'র্‌তে পারিনে কেন? সামান্য পাপ্‌ড়ি ক-টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেম্‌নি বাধা তোমার মধ্যে—কোমল ব'লেই কঠিন! আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কি মনে করো, খুলে' বলো তো।

নন্দিনী

সে আরেক দিন ব'ল্‌বো। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে

না, না, যেয়ো না, ব'লে যাও, আমাকে কি মনে করো বলো।

নন্দিনী

কতোবার ব'লেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড হাতে

প্রচণ্ড জোর ফুলে' ফুলে' উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো—দেখে' আমার মন নাচে।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে দেখে' তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী

সে কথা থাক্, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে

আছে সময়, শুধু এই কথাটি ব'লে যাও!

নন্দিনী

সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝ্‌বে না।

নেপথ্যে

বুঝ্‌বো। বুঝ্‌তে চাই।

নন্দিনী

সব কথা বুঝিয়ে' ব'ল্‌তে পারিনে, আমি যাই।

নেপথ্যে

যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না?

নন্দিনী

হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে

রঞ্জনের মতোই?

নন্দিনী

ঘুরে' ফিরে' একই কথা! এ-সব কথা তুমি বোঝো না।

নেপথ্যে

কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কি। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী

জাদু ব'ল্‌ছো কা'কে ?

নেপথ্যে

বুঝিয়ে ব'ল্‌বো ? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে র'য়েছে জোরের মূর্ত্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠ্‌ছে, ফুল ফুট্‌ছে—সেইখানে র'য়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি ; সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আন্‌তে পারিনে।

নন্দিনী

তোমার এতো আছে, তবু কেবলি অমন লোভীর মতো কথা বলো কেন ?

নেপথ্যে

আমার যা আছে সব বোঝা হ'য়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে' তুলে' তো পরশ-মণি হয় না,—শক্তি যতোই বাড়াই, যৌবনে পৌঁছলো না। তাই পাহারা বসিয়ে' তোমাকে বাঁধ্‌তে চাই, রঞ্জনের মতো যৌবন থাক্‌লে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধ্‌তে পার্‌তুম। এম্‌নি ক'রে বাঁধনের রশিতে গাঁঠ দিতে দিতেই সময় গেলো। হায় রে, আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী

তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছো, তার পরে কেন এমন ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছো বুঝ্‌তে পারিনে।

নেপথ্যে

বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে' ব'ল্‌ছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কতো উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন ক'রে নিয়েছে, তা'তে মরুর পরিসরই বাড়্‌ছে, ঐ একটুখানি

দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তা'কে আপন ক'র্‌তে পার্‌ছে না।

নন্দিনী

তুমি যে এতো ক্লান্ত তোমাকে দেখে' তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

নেপথ্যে

নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝ্‌তেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুন্‌লুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে' গুম্‌রে' হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে' গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে' ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে' তাই বুঝেছিলুম। আর তোমার মধ্যে একটা জিনিষ দেখ্‌ছি—সে এর উল্টো।

নন্দিনী

আমার মধ্যে কি দেখ্‌ছো?

নেপথ্যে

বিশ্বের বাঁশীতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী

বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

নেপথ্যে

সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হাল্‌কা হ'য়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ-নক্ষত্রের দল ভিখারী নট-বালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী তুমি এমন সহজ হ'য়েছো, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষ্যা করি।

নন্দিনী

তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ ক'রে রেখে বঞ্চিত ক'রেছো ; সহজ হ'য়ে ধরা দাও না কেন ?

নেপথ্যে

নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি ক'র্‌তে ব'সেছি। কিন্তু যে-দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছোয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুল্‌তেই হবে।

নন্দিনী

তোমার এসব কথা আমি ভালো বুঝ্‌তে পারিনে, আমি যাই।

নেপথ্যে

আচ্ছা যেয়ো,—কিন্তু জান্‌লার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী

না, না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে

কেবল একখানা হাত দিয়ে ধ'র্‌তে চাই ব'লেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে' যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধ'র্‌তে চাই, ধরা দেবে কি নন্দিন ?

নন্দিনী

তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এসব ব'ল্‌ছো ?

নেপথ্যে

আমার অনবকাশের উজান ঠেলে' তোমাকে ঘরে আন্‌তে

চাইনে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আস্‌বে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগ্‌বে। সে-হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয়নি।

নন্দিনী

আমি তোমাকে ব'ল্‌ছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আন্‌বে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে

তোমার রঞ্জন যে-ছুটি ব'য়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভ'রে রাখে কে, আমি কি জানিনে? নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাবো?

নন্দিনী

আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে

না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী

ছুটি কি ক'রে মধুতে ভরে, তার জবাব, রঞ্জনকে চোখে দেখ্‌লেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

নেপথ্যে

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে' নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে' যায়। আর নয়, যাও তুমি চ'লে যাও—নইলে বিপদ্ ঘ'ট্‌বে।

নন্দিনী

যাচ্ছি, কিন্তু ব'লে গেলুম্, আজ আমার রঞ্জন আস্‌বে, আস্‌বে, আস্‌বে, কিছুতে তাকে ঠেকাতে পার্‌বে না।

[প্রস্থান

[ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ]

ফাগুলাল

আমার মদ কোথায় লুকিয়েছো চন্দ্রা, বের করো !

চন্দ্রা

ও কি কথা ? সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণ-চণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপূজা, সেই সঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা

বলো কি ? ওরা কি ঠাকুর-দেবতা মানে ?

ফাগুলাল

দেখোনি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা ছুটি পেয়েছো ব'লেই মদ ? গাঁয়ে থাক্‌তে পার্ব্বণের ছুটিতে তো—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখী ছুটি পেলে উড়্‌তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে' মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা

কাজ ছেড়ে দাও না, চলো না ঘরে ফিরে'।

ফাগুলাল

ঘরের রাস্তা বন্ধ জানো না বুঝি ?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ ?

Amp. 4065

ফাগুলাল

আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মুনফা নেই।

চন্দ্রা

আমরা কি ওদের দর্‌কারের গায়ে আঁট-ক'রে লাগানো? যেন ধানের গায়ে তুঁষ? ফাল্‌তো কিছুই নেই?

ফাগুলাল

আমাদের বিশু-পাগল বলে, আস্ত হ'য়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দর্‌কার; যারা তাকে খায়, তার হাড়-গোড়, খুব-ল্যাজ বাদ দিয়েই খায়। এমন কি, হাড়-কাঠের সাম্‌নে তারা যে ভ্যাঁ ক'রে ডাকে, সেটাকেও বাহুল্য ব'লে আপত্তি করে। ঐ যে বিশু-পাগল গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে।

চন্দ্রা

কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে' গেছে।

ফাগুলাল

তাই তো দেখ্‌ছি।

চন্দ্রা

ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল

তাতে আর আশ্চর্য্যটা কি?

চন্দ্রা

না, আশ্চর্য্য কিছুই নেই। ওগো সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের ক'র্‌বে—সেদিন পাড়ার লোকের কি দশা হবে? মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ্ ঘটাবে।

ফাগুলাল

বিশুর বিপদ্ আজ ঘটেনি এখানে আস্‌বার অনেক আগে থাক্‌তেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, শুনে' যাও, শুনে' যাও! যাও কোথায়? গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিল্‌তে পারে, নিতান্ত লোক্‌সান হবে না।

[বিশুর প্রবেশ ও গান]

বিশু

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে?
লাগলো পালে নেশার হাওয়া পাগল পরাণ চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে' দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে' দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্‌ রে বেয়ে।

চন্দ্রা

তবে তো আশা নেই, আমরা যে বড়ো কাছে।

বিশু

আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব প'ড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোম্‌টা খুলে' দাও,
তোমার নয়ন তুলে' চাও,
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে॥

চন্দ্রা

তোমার স্বপন-তরীর মেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু

বাইরে থেকে কেমন ক'রে জান্‌বে? আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখোনি।

চন্দ্রা

তরী ডোবাবে একদিন ব'লে দিলুম্, তোমার সেই সাধের নন্দিনী!

[গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ]

গোকুল

দেখো বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেক্‌ছে না।

বিশু

কেন, কি ক'রেছে ?

গোকুল

কিছুই করে না, তাই তো খট্‌কা লাগে। এখানকার রাজা খাম্‌কা ওকে আনালে কেন ? ওর রকমসকম কিছুই বুঝিনে।

চন্দ্রা

বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা, ও যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরীপনা ক'রে বেড়ায় এ আমরা দেখ্‌তে পারিনে !

গোকুল

আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারি।

বিশু

যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে' দেয় এইটেই সর্ব্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝ্‌তেই পারে না, নরকবাসীর সবচেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মূর্খ, কিন্তু এখানকার সর্দ্দার পর্য্যন্ত ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তা জানো ?

বিশু

দেখো, দেখো চন্দ্রা, সর্দ্দারের দু'চক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে, তা হ'লে আমাদের দেখে'ও তোমার চক্ষু লাল হ'য়ে উঠবে। — আচ্ছা তুই কি বলিস্ ফাগুলাল ?

ফাগুলাল

সত্যি কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে' লজ্জা করে। ওর সাম্‌নে কথা কইতে পারিনে।

গোকুল

বিশু ভাই, ঐ মেয়েকে দেখে' তোমার মন ভুলেছে সেইজন্যে দেখ্‌তে পাচ্ছো না ও কি অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝ্‌তে বেশি দেরি হবে না, ব'লে রাখ্‌লুম্।

ফাগুলাল

বিশু ভাই, তোমার বেয়ান জান্‌তে চায় আমরা মদ খাই কেন?

বিশু

স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকেই, এমন কি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরী ক'র্‌তে হয়, আবার মজুরী ভুল্‌তেও হয়। মদ না হ'লে ভোলাবে কিসে?

চন্দ্রা

তাই বই কি! তোমাদের মতো জন্ম-মাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় ক'রে দিয়েছেন।

বিশু

একদিকে ক্ষুধা মার্‌ছে চাবুক, তৃষ্ণা মার্‌ছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে, ব'ল্‌ছে কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, ব'ল্‌ছে, ছুটি, ছুটি!

চন্দ্রা

এই গুলোকে মদ বলে নাকি?

বিশু

প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিন-রাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ-রাজ্যে এলুম্, পাতালে সিঁধ-কাটার কাজে লাগ্‌লুম্, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হ'য়ে গেলো। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি ক'র্‌ছে। সহজ নিঃশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনি মানুষ হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস টানে।

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে' গেলো ওরে,
তবে মরণ-রসে নে পেয়ালা ভ'রে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে' ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙীন ক'রে।

চন্দ্রা

এসো না, বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি-গান সূর্য্যের আলো কড়া ক'রে চু'ইয়ে' নিয়েছি এক-চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব, তেম্‌নি নিবিড় ছুটি।

তোর সূর্য্য ছিলো গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন ম'রেছে অকাজেরি কাজে,
তবে আসুক্ না সেই তিমির রাতি,
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি দিক্-ভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্রা

যাই বলো বিশু বেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই ম'জেছো। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয়নি।

বিশু

হয়নি তো কি? তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে', এখন সোনা সোনা ক'রে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা

কখ্খনো না!

বিশু

আমি ব'ল্ছি হাঁ। ঐ যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ ক'রে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জানো না। অন্তর্য্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে-চাবুক সর্দ্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, তা চলো না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে' যাই।

বিশু

সর্দ্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ ক'রেছে তা নয়, ইচ্ছেটা-সুদ্ধ আট্‌কেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টি'ক্‌তে পার্‌বে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে' ফিরে' আস্‌বে, আফিম্‌খোর পাখী যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি তো একদিন পুঁথি প'ড়ে প'ড়ে চোখ খোয়াতে ব'সেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মূর্খদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন?

চন্দ্রা

এতোদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াইয়ের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেলো না।

ফাগুলাল

অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু

কি বলো দেখি!

ফাগুলাল

আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিলো।

বিশু

সবাই জান্‌তিস্‌ যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখ্‌লি কেন?

ফাগুলাল

এও জানি একাজ তোমার দ্বারা হ'লো না।

চন্দ্রা

এমন আরামের কাজেও টিঁক্‌তে পার্‌লে না, বেয়াই?

বিশু

আরামের কাজ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হ'য়ে লেগে থাকা? ব'ল্‌লুম্‌, "দেশে যাবো, শরীর বড়ো খারাপ।" সর্দ্দার ব'ল্‌লেন "আহা! এতো খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন ক'রে? তবু চেষ্টা দেখো।" চেষ্টা দেখ্‌লুম্‌। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুক্‌লে তার হাঁ বন্ধ হ'য়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি-পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে' গেছি। এখন তোতে-আমাতে তফাৎ এই যে সর্দ্দার তোকে যতোটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়েও বেশি। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল

দুঃখ কি বিশু দাদা? আমরা তো তোমাকে মাথায় ক'রে রেখেছি।

বিশু

প্রকাশ পেলেই মারা যাবো। তোদেব আদর পড়ে যেখানে সর্দ্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই, সোনা-ব্যাঙ্ যতোই মক্‌মক্ শব্দে কোলা ব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়া-সাপের।

চন্দ্রা

কতোদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে?

বিশু

পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দু'দিন, দু'দিনের পর তিন-দিন; সুবঙ্গ কেটেই চ'লেছি, এক-হাতের পব দু'হাত, দু'হাতের পর তিন-হাত। তাল তাল সোনা তুলে' আন্‌ছি, এক-তালের পর দু'তাল, দু'তালের পর তিন-তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চ'লেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদেব কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা?

ফাগুলাল

পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু

আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম্ মানুষ, এখানে হ'য়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপব দিয়ে জুয়োখেলা চ'ল্‌ছে।

চন্দ্রা

বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জ'ম্‌লো, আরো কি দর্‌কার?

বিশু

দর্‌কার ব'লে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে,

পেট ভরিয়ে' তার শেষ পাওয়া যায়, নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝ্‌তে পার্‌লে না?

চন্দ্রা

না!

বিশু

মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে' যাই ভাগ্যের গণ্ডীর মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্ত্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্ব্ব-সাধারণের মাটির টান ও-তে পৌঁছয় না, অসাধারণের আস্‌মানেও উড্‌ছে।

চন্দ্রা

নবান্নের সময় এলো ব'লে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চ'ল্‌ছে। পায়ে পড়ি ঘরে চলো। একবার সর্দ্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশু

স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দ্দারকে এখনো চেনোনি বুঝি?

চন্দ্রা

কেন ওকে দেখে' তো আমার বেশ—

বিশু

হাঁ, বেশ ঝক্‌-ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে-খাঁজে বড়ো পরিপাটি ক'রে কাম্‌ড়ে ধরে। মকররাজ স্বয় ইচ্ছে ক'র্‌লেও আল্‌গা ক'র্‌তে পারে না।

চন্দ্রা

ঐ যে সর্দ্দার।

বিশু

তবেই হ'য়েছে! আমাদের কথা নিশ্চয় শুনেছে।

চন্দ্রা

কেন, এমন তো কিছু বলিনি, যা'তে—

বিশু

বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টীকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

[সর্দ্দারের প্রবেশ]

চন্দ্রা

সর্দ্দার দাদা!

সর্দ্দার

কি নাত্নী, খবর ভালো তো?

চন্দ্রা

একবার বাড়ী যেতে ছুটি দাও।

সর্দ্দার

কেন? যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ীর চেয়ে অনেক ভালো। সরকারী খরচে চৌকীদার পর্য্যন্ত রাখা গেছে। কি হে ৬৯ ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখ্লে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু

সর্দ্দারজী, তোমার ঠাট্টা শুনে' আমোদ লাগ্ছে না। নাচাবার মতো পায়ের জোর থাক্লে এখান থেকে টেনে দৌড় মার্তুম্। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসা কতো সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হ'য়েছে সাদা চালে চ'ল্তেও পা কাঁপে।

সর্দ্দার

নাত্নী, একটা সু-খবর আছে। এদের ভালো-কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে' রেখেছি। এদের কাছ থেকে

প্রণামী আদায় ক'রে খরচটা উঠে' যাবে। গোঁসাইজীর কাছ থেকে রোজ সন্ধ্যে বেলায় এরা—

ফাগুলাল

না, না, সে হবে না, সর্দ্দারজী। এখন সন্ধ্যে বেলায় মদ খেয়ে বড় জোর মাত্‌লামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘ'টবে।

বিশু

চুপ্ চুপ্, ফাগুলাল।

[গোঁসাইয়ের প্রবেশ]

সর্দ্দার

এই যে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তেই উপস্থিত! প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্ব্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হ'য়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তি মন্ত্র দেবেন—ভারী দরকার!

গোঁসাই

এই এদের কথা ব'ল্‌ছো? আহা, এরা তো স্বয়ং কূর্ম্ম-অবতার! বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে ব'লেই সংসারটা টিঁকে আছে। ভাব্‌লে শরীর পুলকিত হয়! বাবা ৪৭ ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে-মুখে নাম কীর্ত্তন করি, সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হ'লো যে নামাবলীখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে' সেখানা বানিয়েছো তোমরাই। এ কি কম কথা! আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বদাই অবিচলিত থাকো, তা হ'লেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের পরে অবিচলিত থাক্‌বে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে' বলো, হরি, হরি! তোমাদের সব বোঝা হাল্‌কা হ'য়ে যাক্! 'হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ'!

চন্দ্রা

আহা, কি মধুর! বাবা, অনেকদিন এমন কথা শুনিনি। দাও, দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও!

ফাগুলাল

এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম্, কিন্তু আর তো পারিনে। সর্দ্দার, এতো বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামী আদায় ক'র্‌তে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইবো না।

বিশু

ফাগুলাল ক্ষেপ্‌লে আর রক্ষে নেই, চুপ্ চুপ্!

চন্দ্রা

ইহকাল পরকাল তুমি দুই খোয়াতে ব'সেছো? তোমার গতি হবে কি? এমন মতি তোমার আগে ছিলো না, আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমাদের উপরে ঐ নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই

যাই বলো, সর্দ্দার, কি সরলতা! পেটে-মুখে এক, এদের আমরা শেখাবো কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছো?

সর্দ্দার

বুঝেছি বৈ কি! এও বুঝেছি উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হ'চ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ও-পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিট্‌খিট্ শুরু ক'র্‌ছে।

গোঁসাই

কোন্ পাড়া ব'ল্‌লে, সর্দ্দার বাবা?

সর্দ্দার

ঐ যে ট-ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ ট হ'চ্ছে মোড়ল। মূর্দ্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোঁসাই

বাবা দন্ত্য-ন-পাড়া যদিও এখনো নড়্‌নড়্ ক'র্‌ছে, মূর্দ্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে ম'জেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান

তৈরি হ'লো ব'লে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, 'নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ'। ফৌজের চাপে অহঙ্কারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা

প্রভু, আশীর্ব্বাদ করো. এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই

ভয় নেই, মা লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

প্রস্থান

সর্দ্দার

ওহে ৬৯ ঙ, তোমাদের ও-পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখ্‌ছি!

বিশু

তা হ'তে পারে। গোঁসাইজী এদের কূর্ম্ম-অবতার ব'ল্‌লেন কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হ'য়ে ওঠে বর্ম্মের বদলে বেরিয়ে' পড়ে দন্ত, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, একটু থামো। সর্দ্দার দাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দ্দার

কিছুতেই না। শুনে' রাখ্‌লুম্, মনেও রাখ্‌বো।

[প্রস্থান

চন্দ্রা

আহা দেখ্‌লে? সর্দ্দার লোকটি কি সরেস? সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু

মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা

কামড়টা এর মধ্যে কোথায়?

বিশু

জানো না, ওরা ঠিক ক'রেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আস্‌তে পার্‌বে না।

চন্দ্রা

কেন?

বিশু

সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা

ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই? তারা কি বলে?

বিশু

তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁষ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে' যায়। আমরা তাঁদের চোখেই পড়িনে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, তোমার ঘরে তো স্ত্রী ছিলো, তার হ'লো কি? অনেক দিন খবর পাইনি।

বিশু

যতোদিন চরের উচ্চপদে ভর্‌তি ছিলুম্‌, সর্দ্দার্ণীদের কোঠা-বাড়ীতে তার তাস-খেলার ডাক প'ড়্‌তো। যখন ফাগুলালদের দলে যোগ দিলুম্‌ ও-পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হ'য়ে গেলো। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেড়ে-দিয়ে চ'লে গেছে।

চন্দ্রা

ছি, এমন পাপও করে !

বিশু

এ-পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দ্দার্ণী হ'য়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা

বিশু বেয়াই, দেখো, দেখো, ঐ কা'রা ধুম ক'রে চ'লেছে ! সারে সারে ময়ূরপংখী, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছো ? ঝলমল ক'র্‌ছে। কি চমৎকার ঘোড়-সওয়ার ! বর্ষার ডগায় যেন এক-এক টুক্‌রো সূর্য্যের আলো বিঁধে' নিয়ে চ'লেছে।

বিশু

ঐ তো সর্দ্দারণীরা ধ্বজাপূজার ভোজে যাত্রা ক'রেছে।

চন্দ্রা

আহা, কি সাজের ধুম ! কি চেহারা ! আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অম্‌নি ধুম ক'রে বেরোতে ? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু

হাঁ, আমাদেরও ঐ দশা ঘট্‌তো।

চন্দ্রা

এখন আর ফের্‌বার পথ নেই ? একেবারে না ?

বিশু

আছে, নর্দ্দমার ভিতর দিয়ে !

নেপথ্যে

পাগল ভাই !

বিশু

কি পাগ্‌লী ?

ফাগুলাল

ঐ তোমার নন্দিনীর ডাক প'ড়্‌লো। আজকের মত বিশু-দাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা

তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি, বেয়াই ?

বিশু

ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা

বেয়াই, অমন উল্‌টিয়ে' কথা কও কেন ?

বিশু

তোরা বুঝ্‌বিনে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল

বিশুদাদা, পষ্ট ক'বে কথা বলো, নইলে বাগ ধরে।

বিশু

ব'লছি শোন, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে-দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখেব দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা

এ-সব কথা বুঝিনে বেয়াই, একটা কথা বুঝি যে, যে-মেয়েকে তোমরা যতো কম বোঝো সেই তোমাদের ততো বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক্ তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ ব'লে রাখ্‌লুম্ ঐ মেয়েটা ওর রক্ত-করবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে আন্‌বে।

[চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান

[নন্দিনীর প্রবেশ]

নন্দিনী

পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিলো, শুনেছিলে ?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মতো, যে গান শুন্‌তে পাবো ? এ যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে'-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

আজ মনের খুশীতে ভাব্‌লুম্ এখানকার প্রাকারের উপর চ'ড়ে ওদের গানে যোগ দেবো। কোথাও পথ পেলুম্ না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু

আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী

তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে' বাহিরকে দেখ্‌তে পাই।

বিশু

তোমার মুখে এ-কথা শুনে' আশ্চর্য্য লাগে।

নন্দিনী

কেন ?

বিশু

যক্ষপুরীতে ঢুকে' অবধি এতোকাল মনে হ'তো জীবন হ'তে আমার আকাশখানা হারিয়ে' ফেলেছি। মনে হ'তো এখানকার টুক্‌রো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক-ঢেঁকিতে কুটে' একটা পিণ্ড পাকিয়ে' তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে

আমার মুখের দিকে এমন ক'রে চাইলে, আমি বুঝ্‌তে পারলুম্‌ আমার মধ্যে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু

সেই আকাশটা আছে ব'লেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

(গান)

তোমায় গান শোনাবো তাই তো আমায় জাগিয়ে' রাখো,
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া!
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।
এলো আঁধার ঘিরে',
পাখী এলো নীড়ে,
তরী এলো তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া!

নন্দিনী

বিশু পাগল, তুমি আমাকে ব'ল্‌ছো "দুখ-জাগানিয়া"?

বিশু

তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যে-দিন এলে যক্ষ-পুরীতে আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থাম্‌তে দিলে না যে।

আমায় পরশ ক'রে,
প্রাণ সুধায় ভ'রে,
তুমি যাও যে স'রে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে' থাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

নন্দিনী

তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে-দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাইনি।

বিশু

কেন, রঞ্জনের কাছে ?

নন্দিনী

না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধ'রে সে আমাকে তুফানের নদী পার ক'রে দেয় ; বুনো ঘোড়ার কেশর ধ'রে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে' নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে' দিয়ে হা হা ক'রে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে' প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেম্‌নি সে তোলপাড় ক'র্‌তে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্ব্বস্ব পণ ক'রে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কি মনে ক'রে বাজি-খেলার ভিড় থেকে এক্‌লা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন ক'রে আমার মুখের দিকে তাকালে, বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌ না।—তার পরে কতোকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো ?

বিশু

(গান)

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগ্‌লো জোয়ার দুখের পারাবারে,
হ'লো কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ঐ পারে।

আমার তরী ছিলো চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেলো খুলে',
তারে হাওয়ায়-হাওয়ায় নিয়ে গেলো কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী

সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুরঙ্গ-খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আন্‌লে ?

বিশু

একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখী যেমন মাটিতে প'ড়ে যায়, সে আমাকে তেম্‌নি ক'রে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে ; আমি নিজেকে ভুলে' ছিলুম্।

নন্দিনী

তোমাকে সে কেমন ক'রে ছুঁতে পারলে ?

বিশু

তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে' পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে আমি দেখ্‌ছিলুম্ মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখ্‌ছিলো সর্দ্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে ব'ল্‌লে "ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কতো বড়ো তোমার সামর্থ্য।" আমি স্পর্দ্ধা ক'রে ব'ল্‌লুম্ "যাবো নিয়ে!" আন্‌লুম্ তাকে সোনার চূড়ার নীচে। তখন আমার ঘোর ভাঙ্‌লো!

নন্দিনী

আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের ক'রে নিয়ে যাবো। সোনার শিকল ভাঙ্‌বো।

বিশু

তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্য্যন্ত টলিয়েছো, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে ? আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না ?

নন্দিনী

এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু

কি-রকম দেখ্‌লে ?

নন্দিনী

দেখ্‌লুম্‌, মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ীর সিংহদ্বার। বাহু দুটো কোন্‌ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হ'লো যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু

ঘরে ঢুকে' কি দেখ্‌লে ?

নন্দিনী

ওর বাঁ হাতের উপর বাজ-পাখী ব'সে ছিলো ; তা'কে দাঁড়ের উপর বসিয়ে' ও আমার মুখে চেয়ে রইলো। তার পরে, যেমন বাজ-পাখীর পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিলো তেম্‌নি ক'রে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে' দিতে লাগ্‌লো। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "আমাকে ভয় করে না ?" আমি ব'ল্‌লুম্‌, "একটুও না।" তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ড'য়ে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে' ব'সে রইলো।

বিশু

তোমার কেমন লাগ্‌লো ?

নন্দিনী

ভালো লাগ্‌লো। কি-রকম ব'ল্‌বো ? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখী। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশী লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খুশীটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু

তার পরে ও কি ব'ল্‌লে?

নন্দিনী

এক-সময় ঝোঁকে উঠে' ওর বর্ষা-ফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো—"আমি তোমাকে জান্‌তে চাই।" আমার কেমন গা শিউরে' উঠ্‌লো। ব'ললুম্‌, "জান্‌বার কি আছে? আমি কি তোমার পুঁথি?" সে ব'ল্‌লে, "পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানিনে।" তার পরে কি-রকম ব্যগ্র হ'য়ে উঠে' ব'ল্‌লে, "রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কি-রকম ভালোবাসো?" আমি ব'ল্‌লুম্‌, "জলের ভিতরকার হাল্‌ যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে—পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।" মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে' চুপ্‌ ক'রে শুনলে। হঠাৎ চম্‌কিয়ে' দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো "ওর জন্যে প্রাণ দিতে পারো?" আমি ব'ল্‌লুম্‌, "এখ্‌খনি।" ও যেন রেগে গর্জ্জন ক'রে ব'ল্‌লে, "কখ্‌খনো না।" আমি ব'ল্‌লুম্‌, "হাঁ পারি।" "তা'তে তোমার লাভ কি?" ব'ল্‌লুম্‌, "জানিনে।" তখন ছট্‌ফট্‌ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, "যাও আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট ক'রো না।" মানে বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌ না।

বিশু

সব কথার পষ্ট মানে ও জান্‌তে চায়। যেটা ও বুঝ্‌তে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল ক'রে দেয়, তা'তেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশু

যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও ম'র্‌বে।

নন্দিনী

না, না, তুমি জানো না, বেঁচে থাক্‌বার জন্যে ও কি-রকম মরীয়া হ'য়ে আছে।

বিশু

ওর বাঁচা ব'ল্‌তে কি বোঝায়, সে তুমি আজই দেখ্‌তে পাবে; জানিনে সইতে পার্‌বে কি না।

নন্দিনী

ঐ দেখো, পাগল ভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দ্দার আমাদের কথা লুকিয়ে' শুনেছে।

বিশু

এখানে তো চারদিকেই সর্দ্দারের ছায়া, এড়িয়ে' চ'ল্‌বার জো কি? সর্দ্দারকে কেমন লাগে?

নন্দিনী

ওর মতো মরা জিনিষ দেখিনি। যেন বেত-বন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে' লিক্‌লিক্ ক'র্‌ছে।

বিশু

প্রাণকে শাসন ক'র্‌বার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী

চুপ্ করো, শুন্‌তে পাবে।

বিশু

চুপ্ করাটাকেও যে শুন্‌তে পায়, তা'তে আপদ্ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি, তখন কথায়-বার্ত্তায় সর্দ্দারকে সাম্‌লে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ ব'লে অশ্রদ্ধা ক'রেই বাঁচিয়ে' রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু পাগ্‌লী, তোর সাম্‌নে মনটা স্পর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে, সাবধান হ'তে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী

না, না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। ঐ যে সর্দ্দার এসে প'ড়েছে।

[সর্দ্দারের প্রবেশ]

সর্দ্দার

কি গো ৬৯ ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছ-বিচার নেই !

বিশু

এমন কি তোমার সঙ্গেও শুরু হ'য়েছিলো, বাছ-রিচার ক'র্‌তে গিয়েই বেধে গেলো।

সর্দ্দার

কি নিয়ে আলাপ চ'ল্‌ছে ?

বিশু

তোমাদের দুর্গ থেকে কি ক'রে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ ক'র্‌ছি।

সর্দ্দার

বলো কি, এতো সাহস ? কবুল ক'র্‌তেও ভয় নেই ?

বিশু

সর্দ্দার, মনে মনে তো সব জানোই। খাঁচার পাখী শলাগুলোকে ঠোক্‌রায় সে তো আদর ক'রে নয়। এ-কথা কবুল ক'র্‌লেই কি, না ক'র্‌লেই কি !

সর্দ্দার

আদর করে না, সে জানা আছে ; কিন্তু কবুল ক'র্‌তে ভয় করে না, সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান্ দিচ্ছে।

নন্দিনী

সর্দ্দারজী তুমি যে ব'লেছিলে আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই. কথা রাখ্‌লে না ?

সর্দ্দার

আজ তাকে দেখ্‌তে পাবে।

নন্দিনী

সে আমি জান্‌তুম্‌। তবু আশা দিলে যখন, জয় হোক্‌ তোমার সর্দ্দার, এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু

ছি ছি, মালাটা নষ্ট ক'র্‌লে! রঞ্জনের জন্যে রাখ্‌লে না কেন?

নন্দিনী

তার জন্যে মালা আছে।

সর্দ্দার

আছে বই কি, ঐ বুঝি গলায় দুল্‌ছে? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান, আর বরণমালা ঐ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো, ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে' যাবে; হৃদয়ের দান, যতো অপেক্ষা ক'র্‌বে ততো তার নাম বাড়্‌বে।

[প্রস্থান

নন্দিনী

[জান্‌লার কাছে]

শুন্‌তে পাচ্ছো?

নেপথ্যে

কি ব'ল্‌তে চাও বলো।

নন্দিনী

একবার জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে

এই এসেছি।

নন্দিনী

ঘবেব মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা ব'ল্‌বার আছে।

নেপথ্যে

বার বাব কেন মিছে অনুবোধ ক'র্‌ছো? এখনো সময় হয়নি। ও কে তোমার সঙ্গে? বঞ্জনের জুড়ি নাকি?

বিশু

না, রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে-পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে

তোমাকে নন্দিনীব কিসেব দর্‌কাব? নন্দিনী, এ-লোকটা তোমার কে?

নন্দিনী

ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়। ঐ তো শিখিয়েছে—

(গান)

"ভালোবাসি, ভালোবাসি,"
এই সুবে কাছে দূবে জলে স্থলে বাজায় বাঁশী।

নেপথ্যে

ঐ তোমার সাথী? ওকে এখনি যদি তোমাব সঙ্গ-ছাড়া করি তা হ'লে কি হয়?

নন্দিনী

তোমার গলার সুব ও কি-বকম হ'য়ে উঠ্‌লো? থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি?

নেপথ্যে

আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কেউ সঙ্গী আছে?

নন্দিনী

আচ্ছা, থাক্ ও-কথা! মা গো, তোমার হাতে ওটা কি?

নেপথ্যে

একটা মরা ব্যাঙ্।

নন্দিনী

কি ক'র্‌বে ওকে নিয়ে?

নেপথ্যে

এই ব্যাঙ্ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিলো। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিলো টিঁকে'। এইভাবে কি ক'রে টিঁকে' থাক্‌তে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখ্‌ছিলুম্; কি ক'রে বেঁচে থাক্‌তে হয়, তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগ্‌লো না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেল্‌লুম্, নিরন্তর টিঁকে'-থাকার থেকে ওকে দিলুম্ মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী

আমারো চারিদিক্ থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে' যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে

তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখ্‌তে চাই।

নন্দিনী

জালের আড়ালে তোমার চশ্‌মার ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পাবে না।

নেপথ্যে

ঘরের ভিতরে বসিয়ে' দেখ্‌বো।

নন্দিনী

তা'তে কি হবে?

নেপথ্যে

আমি জান্‌তে চাই।

নন্দিনী

তুমি যখন জান্‌বার কথা বলো, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে

কেন?

নন্দিনী

মনে হয়, যে-জিনিষটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায় তার পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে

তাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট ক'রো না।—না, না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ঐ যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে প'ড়্‌ছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী

এ নিয়ে কি হবে?

নেপথ্যে

ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধ'রে এসেছে। কখনো ইচ্ছে ক'র্‌ছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাব্‌ছি নন্দিনী যদি কোনো দিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে' দেয়, তা হ'লে—

নন্দিনী

তা হ'লে কি হবে?

নেপথ্যে

তা হ'লে হয়তো আমি সহজে ম'র্‌তে পার্‌বো।

নন্দিনী

একজন মানুষ রক্ত-করবী ভালোবাসে, আমি তা'কে মনে ক'রে ঐ ফুলে আমার কানের দুল ক'রেছি।

নেপথ্যে

তা হ'লে ব'লে দিচ্ছি, ও আমারো শনিগ্রহ, তারো শনিগ্রহ।

নন্দিনী

ছি ছি, ও কি কথা ব'ল্‌ছো? আমি যাই।

নেপথ্যে

কোথায় যাবে?

নন্দিনী

তোমার দুর্গ-দুয়ারের কাছে ব'সে থাক্‌বো।

নেপথ্যে

কেন?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আস্‌বে, দেখ্‌তে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে যদি দ'লে ধূলোর সঙ্গে মিলিয়ে' দিই, আর তা'কে একটুও চেনা না যায়!

নন্দিনী

আজ তোমার কি হ'য়েছে? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছো কেন?

নেপথ্যে

মিছিমিছি ভয়? জানো না, আমি ভয়ঙ্কর?

নন্দিনী

হঠাৎ তোমার এ কি ভাব? লোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখ্‌তে ভালোবাসো? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে—সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁত্‌কে উঠ্‌লে

সে ভারি খুশী হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কি মনে হয়, সত্যি ব'ল্‌বো? রাগ ক'র্‌বে না?

নেপথ্যে

কি বলো দেখি?

নন্দিনী

ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে' অদ্ভুত সাজিয়ে' রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাক্‌তে লজ্জা করে না?

নেপথ্যে

কি ব'ল্‌ছো, নন্দিনী?

নন্দিনী

এতোদিন যাদের ভয় দেখিয়ে' এসেছো তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা ক'র্‌বে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাক্‌তো, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে ম'র্‌তো তবু ভয় পেতো না।

নেপথ্যে

তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয়! এতোদিন যা কিছু ভেঙে চুরমার ক'রেছি তারি রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে' দেখাতে ইচ্ছে ক'র্‌ছে। তার পরে—

নন্দিনী

তার পরে কি?

নেপথ্যে

তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে' দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেম্‌নি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে—যাও, যাও, এখনি পালিয়ে' যাও, এখনি!

নন্দিনী

এই রইলুম্ দাঁড়িয়ে। কি ক'র্‌তে পারো, করো। অমন বিশ্রী ক'রে গর্জ্জন ক'র্‌ছো কেন?

নেপথ্যে

আমি যে কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে' দিতে ইচ্ছে ক'র্‌ছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্ত্তনাদ শোনোনি?

নন্দিনী

শুনেছি, সে কিসের আর্ত্তনাদ?

নেপথ্যে

সৃষ্টিকর্ত্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্ম্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে' নিতে চাই, সেই-সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি ক'র্‌তে হ'লে তা'কে পোড়াতে হয়। নন্দিনী তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন! একদিন দাহন ক'রে তাকে বের ক'রবো তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর?

নেপথ্যে

আমি হয় পাবো, নয় নষ্ট ক'র্‌বো। যা'কে পাইনে তা'কে দয়া ক'র্‌তে পারিনে! তা'কে ভেঙে-ফেলাও খুব এক-রকম ক'রে পাওয়া।

নন্দিনী

ও কি, অমন মুঠো পাকিয়ে' হাত বের ক'র্‌ছো কেন?

নেপথ্যে

আচ্ছা, হাত সরিয়ে' নিচ্ছি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজ-পাখীর ছায়া দেখে'।

নন্দিনী

আচ্ছা, যাই আর তোমাকে রাগাবো না!

নেপথ্যে

শোনো, শোনো ফিরে' এসো তুমি! নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী

কি, বলো।

নেপথ্যে

সাম্‌নে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্‌না। আমার এই হাত-দুটো সে-দিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে ম'রবার আরাম পেয়েছিলো। মরণের মাধুর্য্য আর কখনো এমন ক'রে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে ক'র্‌ছে। তুমি জানো না, আমি কতো শ্রান্ত।

নন্দিনী

তুমি কি কখনো ঘুমোও না?

নেপথ্যে

ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী

তোমাকে আমার গানটা শেষ ক'রে শুনিয়ে' দিই—

ভালোবাসি ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশী।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে

থাক্ থাক্, থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী

সেই সুরে সাগর-কূলে
বাঁধন খুলে'
অতল রোদন উঠে দুলে'।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে'-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি।

পাগল ভাই, ঐ যে মরা ব্যাঙ্‌টা ফেলে' রেখে দিয়ে কখন্ পালিয়েছে। গান শুন্‌তে ও ভয় পায়।

বিশু

ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙ্‌টা সকল-রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে' আছে, গান শুন্‌লে তার ম'র্‌তে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে। পাগ্‌লী, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখ্‌ছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অরুণোদয় হ'য়েছে আমাকে ব'ল্‌বিনে?

নন্দিনী

মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আস্‌বে।

বিশু

নিশ্চয় খবর এলো কোন্ দিক্ থেকে?

নন্দিনী

তবে শোনো বলি। আমার জান্‌লার সাম্‌নে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখী এসে বসে। আমি সন্ধ্যে হ'লেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম ক'রে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে' পড়ে তো জান্‌বো, আমার রঞ্জন আস্‌বে। আজ সকালে জেগে উঠে'ই দেখি উত্তরে'-হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে প'ড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

তাই তো দেখ্‌ছি, আর দেখ্‌ছি, কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ প'রেছো।

নন্দিনী

দেখা হ'লে এই পালক আমি তার চূড়োয় পরিয়ে' দেবো।

বিশু

লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী

রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশু

পাগ্‌লী, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী

না, আজ তোমাকে কাজ ক'র্‌তে দেবো না।

বিশু

কি ক'র্‌বো বলো ?

নন্দিনী

গান করো।

বিশু

কি গান ক'র্‌বো ?

নন্দিনী

পথ-চাওয়ার গান।

বিশু

(গান)

যুগে-যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিলো সে !
সেই বুঝি মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন তারে চোখের কোণে

দেখেছিলেম্ অস্ফুট প্রদোষে,
সেই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে।
আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে,
রাতের মুখের আঁধার-খানি খুল্‌বে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে, সেই আলোকে দেখা হবে, এক-পলকে
সব আবরণ যাবে যে খ'সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে।

নন্দিনী

পাগল, যখন তুমি গান করো তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিলো কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারিনি।

বিশু

তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে প'রে চ'লে যাবো। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি ক'র্‌বো না।—এখন কোথায় যাবি ?

নন্দিনী

পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আস্‌বে। সেইখানে ব'সে আবার তোমার গান শুন্‌বো।

[উভয়ের প্রস্থান

[সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ]

সর্দ্দার

না, এ-পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আস্‌তে দেওয়া চ'ল্‌বে না।

মোড়ল

ওকে দূরে রাখ্‌বো ব'লেই বজ্রগড়ের সুরঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম্।

সর্দ্দার

তা কি হ'লো ?

মোড়ল

কিছুতেই পারা গেলো না। সে ব'ল্‌লে—হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।

সর্দ্দার

অভ্যেস এখনি শুরু করাতে দোষ কি ?

মোড়ল

সে-চেষ্টা করা গেলো। বড়ো-মোড়ল এলো কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়-ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অম্‌নি হো-হো ক'রে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে—গাম্ভীর্য্য নির্ব্বোধের মুখোস, আমি তাই খসাতে এসেছি।

সর্দ্দার

ওকে সুরঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে' দিলে না কেন ?

মোড়ল

দিয়েছিলুম্, ভাব্‌লুম্ চাপে প'ড়ে বশ মানবে। উল্টো হ'লো, খোদাই-করদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেলো। তাদের মাতিয়ে' তুল্‌লে, ব'ল্‌লে—আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।

সর্দ্দার

খোদাই-নৃত্য ? তার মানে কি ?

মোড়ল

রঞ্জন ধ'র্‌লে গান, ওরা ব'ল্‌লে মাদল পাই কোথায় ? ও ব'ল্‌লে—মাদল না থাকে কোদাল আছে। তালে তালে কোদাল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো ; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কি লোফালুফি ! বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে ব'ল্‌লে—"এ কেমন তোমার কাজের ধারা ?"

রঞ্জন ব'ল্‌লে—"কাজের রশি খুলে' দিয়েছি, তা'কে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চ'ল্‌বে।"

সর্দ্দার

লোকটা পাগল দেখ্‌ছি।

মোড়ল

ঘোর পাগল। ব'ল্‌লুম্, কোদাল ধরো। ও বলে, তার চেয়ে বেশী কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।

সর্দ্দার

তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবের-গড়ে এলো, কি ক'রে?

মোড়ল

কি জানি প্রভু। শিকল দিয়ে তো ওকে ক'ষে বাঁধা গেলো। খানিক বাদে দেখি, কেমন ক'রে পিছ্‌লে' বেরিয়ে' এসেছে—ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য্য ওর ক্ষমতা। কিছু-দিন ও এখানে থাক্‌লে খোদাইকরগুলো পর্য্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দ্দার

ও কি? ঐ না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চ'লেছে গান গেয়ে? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় ক'রেছে। স্পর্দ্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই!

মোড়ল

তাই তো! কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে' এসেছে। ভেল্‌কি জানে।

সর্দ্দার

যাও, এই বেলা ধরোগে ওকে। এ-পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিল্‌তে না পারে।

মোড়ল

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওর দল ভারি হ'য়ে উঠ্‌ছে। কখন্ আমাদের শুদ্ধ নাচিয়ে তুল্‌বে।

[ছোটো সর্দ্দারের প্রবেশ]

সর্দ্দার

কোথায় চ'লেছো ?

ছোটো সর্দ্দার

রঞ্জনকে বাঁধ্‌তে চ'লেছি।

সর্দ্দার

তুমি কেন ? মেজো সর্দ্দার কোথায় ?

ছোটো সর্দ্দার

ওকে দেখে' তাঁর এত মজা লেগেছে তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চা'ন না। বলেন, আমরা সর্দ্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছি সে ওর হাসি দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি।

সর্দ্দার

শোনো, ওকে বাঁধ্‌তে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে' দাও!

ছোটো সর্দ্দার

ও তো রাজার ডাক মান্‌তেই চায় না।

সর্দ্দার

ওকে বলোগে রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী ক'রে রেখেছে।

ছোটো সর্দ্দার

কিন্তু রাজা যদি—

সর্দ্দার

কিছু ভাব্‌তে হবে না। চলো আমি নিজে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান

[অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ]

পুরাণবাগীশ

ভিতরে এ কি প্রলয়কাণ্ড হ'চ্ছে বলো তো ? ভয়ঙ্কর শব্দ যে !

অধ্যাপক

রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরী একটা-কিছু চুরমার ক'রে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ

মনে হ'চ্ছে বড়ো বড়ো থাম হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক

আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে' একটা সরোবর ছিলো, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তা'তে জমা হ'তো। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাৎ হ'য়ে প'ড়্‌লো, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্‌খল্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেলো। কিছু-দিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হ'চ্ছে, ওর সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষ'য়ে এসেছে।

পুরাণবাগীশ

বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আন্‌লে, আর কি ক'র্‌তেই বা আন্‌লে ?

অধ্যাপক

জগতে যা-কিছু জান্‌বার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ ক'র্‌তে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় ক'রে নিয়েছে, এখন থেকে থেকে রেগে উঠে' ব'ল্‌ছে "তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের ক'রেছে। কিন্তু প্রাণ-পুরুষের অন্দরমহল কোথায় ?" ভাব্‌লুম, এখন কিছু-দিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে' রাখা যাক্—

আমার থ'লে ঝাড়া হ'য়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক্। ঐ দেখ্‌তে পাচ্ছো, কে যাচ্ছে ?

পুরাণবাগীশ

একটি মেয়ে ধানী-রঙের কাপড়-পরা।

অধ্যাপক

পৃথিবীর প্রাণভরা খুশীখানা নিজের সর্ব্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দ্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দ্দফরাস আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বে-খাপ। চারদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হ'ল সুর-বাঁধা তম্বুরা।

অধ্যাপক

এক-একদিন ওর চ'লে-যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তু-চর্চ্চার জাল ছিঁড়ে' যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মতো হুশ্ ক'রে পালায়।

পুরাণবাগীশ

বলো কি হে, তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি ?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশী হ'লেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সাম্‌লানো যায় না।

পুরাণবাগীশ

এখন বলো তো তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায় ?

অধ্যাপক

দেখার উপায় নেই, ঐ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ

বলো কি হে ? এই জালের আড়াল থেকে ?

অধ্যাপক

তা নয় তো কি ? ঘোম্‌টার আড়াল থেকে যে-রকম রসালাপ হ'তে পারে সে-ধরণের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধ হয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

অধ্যাপক

কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিষ সৃষ্টি ক'রেছেন বাজে জিনিষকে লালন ক'র্‌বার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ

আজকাল দেখ্‌ছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানী-রঙের দিকে একটানা ছুটে' চ'লেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য করো কি ক'রে ?

অধ্যাপক

সত্যি কথা ব'ল্‌বো ? আমি ওকে ভালোবাসি।

পুরাণবাগীশ

বলো কি হে ?

অধ্যাপক

তুমি জানো না, ও এত-বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট ক'র্‌তে পারে না।

[সর্দ্দারের প্রবেশ]

সর্দ্দার

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছো বুঝি! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেছে।

অধ্যাপক

কি-রকম?

সর্দ্দার

রাজা বলে, পুরাণ ব'লে কিছু নেই। বর্ত্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চ'লেছে।

পুরাণবাগীশ

পুরাণ যদি নেই, তা হ'লে কিছু আছে কি ক'রে? পিছন যদি না থাকে তো সাম্‌নেটা কি থাক্‌তে পারে?

সর্দ্দার

রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ ক'রে চ'লেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে—মহাকাল পুরাতনকে পিছনে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক

নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়া-বীথিকায় নবীনের মায়া-মৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখ্‌তে পাচ্ছেন, ধ'র্‌তে পার্‌ছেন না, রেগে উঠ্‌ছেন আমার বস্তুতত্ত্বর উপর।

[নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ]

নন্দিনী

সর্দ্দার, সর্দ্দার, ও কি! ও কা'রা!

সর্দ্দার

কি গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা প'র্‌বো যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো আনাই অস্পষ্ট

হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন হয় তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখো, ও কি ভয়ানক দৃশ্য! প্রেতপুরীর দরজা খুলে' গেছে নাকি? ঐ কা'রা চ'লেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ঐ যে বেরিয়ে' আস্‌ছে রাজার মহলের খিড়্‌কি-দরজা দিয়ে?

সর্দ্দার

ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী

মানে কি?

সর্দ্দার

মানে একদিন তুমিও বুঝ্‌বে, আজ থাক্‌।

নন্দিনী

কিন্তু এ-সব কি চেহারা? ওরা কি মানুষ? ওদের মধ্যে মাংস-মজ্জা মন-প্রাণ কিছু কি আছে?

সর্দ্দার

হয় তো নেই।

নন্দিনী

কোনো দিন ছিলো?

সর্দ্দার

হয় তো ছিলো।

নন্দিনী

এখন গেলো কোথায়?

সর্দ্দার

বস্তুবাগীশ, পারো তো বুঝিয়ে' দাও, আমি চ'ল্‌লুম্‌।

[প্রস্থান

নন্দিনী

ও কি ? ঐ-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখ্‌ছি। ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেম্‌নি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দ্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেল্‌তে আস্‌তো। ম'রে যাই, ওদের এমন দশা কে ক'র্‌লে ? ঐ যে দেখি শকুলু, তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে পেতো মালা। অনূ—প, শকুলু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানীপাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে' দেখ্‌লে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হ'য়ে গেছে। ও কি! কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে' ফেলে' দিয়েছে! বড়ো লাজুক ছিলো; যে-ঘাটে জল আন্‌তে যেতুম্‌, তারি কাছে ঢালু পাড়ির পরে ব'সে থাক্‌তো, ভাণ ক'র্‌তো যেন তীর বানাবার জন্য শর ভাঙ্‌তে এসেছে। দুষ্টমি ক'রে ওকে কতো দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে' চা আমার দিকে! হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠ্‌তো, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না! গেলো গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে' গেলো! অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষ'য়ে গেছে, কালো ম'র্‌চেটাই বাকি! এমন কেন হ'লো ?

অধ্যাপক

নন্দিনী, যে-দিক্‌টাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিক্‌টাতেই প'ড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখ্‌বে তার জিহ্বা লক্‌লক্‌ ক'র্‌ছে।

নন্দিনী

তোমার কথা বুঝ্‌তে পারছিনে।

অধ্যাপক

রাজাকে তো দেখেছো! তার মূর্ত্তি দেখে' শুন্‌ছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হ'য়েছে?

নন্দিনী

হ'য়েছে বই কি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক

সেই অদ্ভুতটি হ'লো যার জমা, এই কিম্ভুতটি হ'লো তার খরচ। ঐ ছোটোগুলো হ'তে থাকে ছাই, আর ঐ বড়োটা জ্ব'ল্‌তে থাকে শিখা। এই হ'চ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী

ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক

তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয়, সেটা হয়; তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী

এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তা হ'লে চাইনে আমি হওয়া—আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে চ'লে যাবো—আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও!

অধ্যাপক

রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা ব'লে কোনো বালাই নেই। দেখো না পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন্ স'রে প'ড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে' বাঁচ্‌বেন। একটু এগোলেই বুঝ্‌বেন বেড়া-জাল এখান থেকে শুরু ক'রে বহু যোজন দূর পর্য্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ ক'র্‌ছো তুমি! তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়-গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

নন্দিনী

[জান্‌লা ঠেলিয়া]

শোনো, শোনো !

অধ্যাপক

কা'কে ডাক্‌ছো তুমি ?

নন্দিনী

জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক

ভিতরকার কপাট প'ড়ে গেছে, ডাক শুন্‌তে পাবে না।

নন্দিনী

বিশু পাগল, পাগল ভাই !

অধ্যাপক

তা'কে ডাক্‌ছো কেন ?

নন্দিনী

এখনো যে সে ফির্‌লো না ! আমার ভয় ক'র্‌ছে।

অধ্যাপক

একটু আগেই তোমাব সঙ্গেই তো দেখেছি।

নন্দিনী

সর্দ্দার ব'ল্‌লে, রঞ্জনকে চিনিয়ে' দেবার জন্যে তার ডাক প'ড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম্, দিলে না। ও কিসের আর্ত্তনাদ ?

অধ্যাপক

এ বোধ হ'চ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী

কে সে ?

অধ্যাপক

সেই যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু, যার ভাই ভজন স্পর্দ্ধা ক'রে রাজার

সঙ্গে কুস্তি ক'র্‌তে এলো ; তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো কোথাও দেখা গেলো না। সেই রাগে গজ্জু এলো তাল ঠুকে'। ওকে গোড়াতেই ব'লেছিলুম্— এ-রাজ্যে সুরঙ্গ খুদ্‌তে চাও তো এসো ম'র্‌তে ম'র্‌তেও কিছুদিন বেঁচে থাক্‌বে। আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও তো একমুহূর্ত্ত সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।

নন্দিনী

দিন-রাত এই মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারি ক'রে এরা একটুও কি ভালো থাকে ?

অধ্যাপক

ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এতো ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সাম্‌লাবে কে ? জাল তাই বেড়েই চ'লেছে। ওদের যে থাক্‌তেই হবে।

নন্দিনী

থাক্‌তেই হবে ? মানুষ হ'য়ে থাক্‌বার জন্যে যদি ম'র্‌তেই হয়, তা'তেই বা দোষ কি ?

অধ্যাপক

আবার সেই রাগ ? সেই রক্ত-করবীর ঝঙ্কার ? খুব মধুর, তবুও যা সত্য, তা সত্য। থাক্‌বার জন্যে ম'র্‌তে হবে, একথা ব'লে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু থাক্‌বার জন্যে মার্‌তে হবে, এ-কথা যারা বলে তা'রাই থাকে। তোমরা বলো এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে' ওঠে।

[পালোয়ানের প্রবেশ]

নন্দিনী

আহা, ঐ দেখো, কি-রকম ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে আস্‌ছে। পালোয়ান, এইখানে শুয়ে' পড়ো। অধ্যাপক, দেখো না কোথায় চোট লেগেছে?

অধ্যাপক

বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখ্‌তেই পাবে না।

পালোয়ান

দয়াময় ভগবান্, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর এক-দিনের জন্যেও!

অধ্যাপক

কেন হে?

পালোয়ান

কেবল ঐ সর্দ্দারটার ঘাড় ম'ট্‌কে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক

সর্দ্দার তোমার কি ক'রেছে?

পালোয়ান

সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো ল'ড়্‌তে চাইনি। আজ ব'লে বেড়াচ্ছে, আমারি দোষ।

অধ্যাপক

কেন? ওর কি স্বার্থ?

পালোয়ান

সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি ক'র্‌তে পার্‌লে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখ-দুটো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পারি, যেন ওর জিভ্‌টা টেনে বের করি।

নন্দিনী

তোমার কি-রকম বোধ হ'চ্ছে পালোয়ান?

পালোয়ান

বোধ হ'চ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হ'য়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্য্যন্ত শুষে' নেয়।—যদি কোনো উপায়ে একবার—হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার—তোমার দয়া হ'লে কি না হ'তে পাবে! সর্দ্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি!

নন্দিনী

অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দু'জনে মিলে, আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক

সাহস করিনে নন্দিনী। এখানকার নিয়ম-মতে তা'তে অপরাধ হবে।

নন্দিনী

মানুষটাকে ম'র্‌তে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক

যে-অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই, সেটা পাপ হ'তে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চ'লে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে' গাছ মাটির নীচে হরণ-শোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখ্‌বো ব'লে তাকিয়ে' আছি। ঐ যে সর্দ্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী

আমার উপরে কেন এতো রাগ?

অধ্যাপক

আন্দাজে ব'ল্‌তে পারি। তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছো; যতোই সুর মিল্‌ছে না, বেসুর ততোই কড়া হ'য়ে চেঁচিয়ে' উঠ্‌ছে।

[প্রস্থান

[সর্দ্দারের প্রবেশ]

নন্দিনী

সর্দ্দার!

সর্দ্দার

নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে' গোঁসাইজীব দুই চক্ষু—এই যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম! প্রভু! সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিলো।

[গোঁসাইয়ের প্রবেশ]

গোঁসাই

আহা, শুভ্র প্রাণের দান! ভগবানের শুভ্র কুন্দ-ফুল! বিষয়ী লোকের হাতে প'ড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হ'লো না। এতেই তো পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখ্‌তে পাই।

নন্দিনী

গোঁসাইজী, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি।

গোঁসাই

সব দিক্ ভেবে যে-পরিমাণ বাঁচা দর্‌কার, আমাদের সর্দ্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে' রাখ্‌বে। কিন্তু বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করিনে।

নন্দিনী

এ-রাজ্যে বাঁচিয়ে' রাখার বুঝি পরিমাণ-বিচার আছে?

গোঁসাই

আছে বই কি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে' তার ভাগ-বাটোয়ারা ক'র্‌তে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের, 'পরে ভগবান্ দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন ক'র্‌তে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি-পরিমাণে পড়া চাই। ওদেব খুব কম বাঁচ্‌লেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। এ কি ওদেব পক্ষে কম বাঁচোয়া ?

নন্দিনী

গোঁসাইজী ভগবান্ তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন ?

গোঁসাই

যে-প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার অংশভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝ'গ্‌ড়ার দরকারই হয় না. আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে, তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী

তবে কি এ-লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এই-রকম আধ-মরা হ'য়েই প'ড়ে থাক্‌বে।

গোঁসাই

প'ড়েই বা থাক্‌বে কেন ? কি বলো সর্দ্দার ?

সর্দ্দার

সে তো ঠিক। প'ড়ে থাক্‌তে দেবো কেন! এখন থেকে নিজের জোরে চ'ল্‌বার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে' নিয়ে বেড়াবো। ওরে গজ্জু!

পালোয়ান

কি প্রভু!

গোঁসাই

হরি, হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হ'য়ে এসেছে, মনে হ'চ্ছে আমাদের নাম-কীর্ত্তনের দলে টেনে নিতে পার্‌বো।

সর্দ্দার

চ-ক্ষ পাড়াব মোড়লের ঘরে তোর বাসা হ'য়েছে, চ'লে যা সেখানে।

নন্দিনী

ও কি কথা! চ'ল্‌তে পার্‌বে কেন!

সর্দ্দার

দেখো নন্দিনী, মানুষ-চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু!

গজ্জু

যে আদেশ!

নন্দিনী

পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখ্‌বার কেউ নেই।

গজ্জু

না, না, থাক্, সর্দ্দার রাগ ক'র্‌বে।

নন্দিনী

আমি সর্দ্দারের রাগকে ভয় করিনে।

গজ্জু

আমি ভয় করি, দোহাই তোমার আমার বিপদ্ বাড়িয়ো না।

[প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দ্দার, যেয়ো না, ব'লে যাও আমার বিশু পাগলকে কোথায় নিয়ে গেছো ?

সর্দ্দার

আমি নিয়ে যাবার কে ? বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা ?

নন্দিনী

এ কোন্ সর্ব্বনেশে' দেশ গো। তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয় ? তোমরা হাওয়া, তা'রা মেঘ ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জানো, কোথায় আমার বিশু পাগল আছে।

গোঁসাই

আমি নিশ্চয় জানি, যে যেখানে থাকে সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী

কার ভালোর জন্যে ?

গোঁসাই

সে তুমি বুঝ্‌বে না। আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপ-মালা। ঐ গেলো ছিঁড়ে'! ওহে সর্দ্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দ্দার

কে জানে ও কেমন ক'রে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

গোঁসাই

ওহে, এইবার আমার নামাবলীটা-শুদ্ধ ছিঁড়্‌বে। বিপদ্ ক'র্‌লে ! আমি চ'ল্‌লুম্ !

[প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দ্দার, ব'ল্‌তেই হবে কোথায় নিয়ে গিয়েছো বিশু পাগলকে ?

সর্দ্দার

তা'কে বিচার-শালায় ডেকেছে—এর বেশি ব'ল্‌বার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী

আমি নারী ব'লে আমাকে ভয় ক'রো না ? বিদ্যুৎ-শিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে' দেন। আমি সেই বজ্র ব'য়ে এনেছি, ভাঙ্‌বে তোমার সর্দ্দারির সোনার চূড়া।

সর্দ্দার

তবে সত্য কথাটা তোমাকে ব'লে যাই। বিশুর বিপদ্‌ ঘটিয়েছো তুমিই !

নন্দিনী

আমি !

সর্দ্দার

হাঁ, তুমিই। এতোদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত্ত ক'রে সে চ'লেছিলো, তা'কে ম'র্‌বার পাখা মেল্‌তে শিখিয়েছো তুমিই ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টান্‌বে, তার পরে শেষ বোঝা-পড়া হবে তোমাতে-আমাতে ! বেশী দেরী নেই !

নন্দিনী

তাই হোক্‌, কিন্তু একটা কথা ব'লে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে দেবে কি ?

সর্দ্দার

কিছুতে না।

নন্দিনী

কিছুতে না ! দেখ্‌বো তোমার সাধ্য কিসের ! তার সঙ্গে

আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে ব'লে দিলুম্।

[সর্দ্দারের প্রস্থান

নন্দিনী

[জান্‌লায় ঘা দিয়ে]

শোনো, শোনো, রাজা! কোথায় তোমার বিচার-শালা? তোমার জালের এই আড়াল ভাঙ্‌বো আমি। ও কে ও! কিশোর যে! ব'ল্ তো আমায়, জানিস্ কি, কোথায় আমাদের বিশু?

কিশোর

হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক ক'রে রাখো। জানিনে, প্রহরীদের কর্ত্তা আমার মুখ দেখে' কেন দয়া ক'র্‌লে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজী হ'লো।

নন্দিনী

প্রহরীদের কর্ত্তা! তবে কি--

কিশোর

হাঁ, ঐ যে আস্‌ছে।

নন্দিনী

ও কি! তোমার হাতে হাত-কড়ি! পাগল ভাই, তোমাকে ওরা অমন ক'রে কোথায় নিয়ে চ'লেছে?

[বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ]

বিশু

ভয় নেই, কিছু ভয় করিস্‌নে! পাগ্‌লি, এতোদিন পরে আমার মুক্তি হ'লো।

নন্দিনী

কি ব'ল্‌ছো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

বিশু

যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ্ সাম্‌লে চ'ল্‌তুম্, তখন ছাড়া ছিলুম্। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী

কি দোষ ক'রেছো যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চ'লেছে?

বিশু

এতোদিন পরে আজ সত্যকথা ব'লেছিলুম্।

নন্দিনী

তা'তে দোষ কি হ'য়েছে।

বিশু

কিচ্ছু না।

নন্দিনী

তবে এমন ক'রে বাঁধ্‌লে কেন?

বিশু

এতেই বা ক্ষতি কি হ'লো? সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি— এ-বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হ'য়ে রইলো।

নন্দিনী

ওরা তোমাকে পশুব মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চ'লেছে, ওদের নিজেরই লজ্জা ক'র্‌ছে না? ছি, ছি ওরাও তো মানুষ।

বিশু

ভিতরে মস্ত একটা পশু র'য়েছে যে—মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার ল্যাজ ফুল্‌তে থাকে, দুল্‌তে থাকে।

নন্দিনী

আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে? এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে?

বিশু

চাবুক মেরেছে, যে-চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরী সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরী। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে-কথা ওরা ভুলে' যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী

আমাকেও এম্‌নি ক'রে তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক্, ভাই আমার! তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই, তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচ্‌বে না।

কিশোর

বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি, নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

বিশু

এ যে তোর পাগলের মতো কথা।

কিশোর

শাস্তিতে তো আমাকে বাজ্‌বে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশী হ'য়ে সইতে পার্‌বো।

নন্দিনী

আহা, না কিশোর, ও-কথা বলিস্‌নে!

কিশোর

নন্দিনী, আমি কাজ কামাই ক'রেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তা'রা যে অপমান ক'র্‌বে, এই শাস্তি তা'র থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু

না, কিশোর এখনো ধরা প'ড়্‌লে চ'ল্‌বে না। একটা

বিপদের কাজ ক'রবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন ক'রে পারিস্ তা'কে বের ক'র্‌তে হবে। সহজ নয়।

কিশোর

নন্দিনী, তা হ'লে বিদায় নিলুম্। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হ'লে তোমার কোন কথা তা'কে জানাবো ?

নন্দিনী

কিছু না। তা'কে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।

[কিশোরের প্রস্থান

বিশু

এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক্ !

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ-কথা কোনোদিন ভুল্‌তে পার্‌বো না, যে তোমাকে শূন্য-হাতে বিদায় দিয়েছি। আর ঐ যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কি বা পেলে ?

বিশু

মনে যে-আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছো তা'তে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কি চাই ? মনে আছে সেই নীলকণ্ঠের পালখ রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে' দিতে হবে ?

নন্দিনী

এই যে র'য়েছে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

পাগ্‌লি শুন্‌তে পাচ্ছিস্ ঐ ফসল-কাটার গান ?

নন্দিনী

শুন্‌তে পাচ্ছি. প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে।

বিশু

মাঠের লীলা শেষ হ'লো, ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চ'ল্‌লো। চলো প্রহরী, আর দেরী নয়—

(গান)

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক্ তা মাটি।

[সকলের প্রস্থান

[চিকিৎসক ও সর্দ্দারের প্রবেশ]

চিকিৎসক

দেখ্‌লুম্। রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। এ-রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দ্দার

এর প্রতিকার কি?

চিকিৎসক

বড়ো-রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে' তোলা।

সর্দ্দার

অর্থাৎ আর কারো ক্ষতি ক'র্‌তে না দিলে, উনি নিজের ক্ষতি ক'র্‌বেন।

চিকিৎসক

ওরা বড়ো-লোক, বড়ো শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আরেকটা খেলা না জুগিয়ে' দিলে নিজের খেল্‌না ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো, সর্দ্দার, আর বড়ো দেরী নেই।

সর্দ্দার

লক্ষণ দেখে' আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু হায়,

হায়, কি দুঃখ! আমাদের স্বর্ণপুরী যে-রকম ঐশ্বর্য্যে ভ'রে উঠেছিলো, এমন কোনোদিন হয়নি, ঠিক সময়টাতেই—আচ্ছা যাও, ভেবে দেখ্‌ছি!

[চিকিৎসকের প্রস্থান

[মোড়লের প্রবেশ]

মোড়ল

সর্দ্দার-মহারাজ, ডেকেছেন? আমি ঞ-পাড়ার মোড়ল।

সর্দ্দার

তুমিই তো তিন-শো-একুশ?

মোড়ল

প্রভুর কি স্মরণ-শক্তি! আমার মতো অভাজনকেও ভোলেন না!

সর্দ্দার

দেশ থেকে আমার স্ত্রী আস্‌ছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে' দেওয়া চাই।

মোড়ল

পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টান্‌বার মতো বলদের অভাব। তা হোক্, খোদাইকরদের লাগিয়ে' দেওয়া যাবে।

সর্দ্দার

কোথায় যেতে হবে জানো তো? বাগানবাড়ীতে, যেখানে সর্দ্দারদের ভোজ।

মোড়ল

যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা ব'লে দিয়ে যাই। একটু কান দেবেন। ঐ যে ৬৯ ঙ, লোকে যাকে বিশু পাগল বলে, ওর পাগ্‌লামিটাকে শোধন ক'র্‌বার সময় এসেছে।

সর্দ্দার

কেন? তোমাদের পরে উৎপাত করে নাকি?

মোড়ল

মুখের কথায় নয়, ভাবে-ভঙ্গীতে !

সর্দ্দার

আর ভাবনা নেই। বুঝেছো ?

মোড়ল

তাই নাকি ? তা হ'লে ভালো। আরেকটা কথা ; ঐ যে ৪৭ ফ, ৬৯ ঙব সঙ্গে ওর কিছু বেশী মেশামেশি।

সর্দ্দার

সেটা লক্ষ্য ক'রেছি।

মোড়ল

প্রভুর লক্ষ্য ঠিকই আছে। তবু নানান্ দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে হয় নাকি—তুই-একটা ফস্‌কিয়ে' যেতেও পারে। এই দেখুন না, আমাদের ৯৫,—গ্রামসম্পর্কে আমার পিস্‌শ্বশুর—পাঁজরের হাড় ক'খানা দিয়ে সর্দ্দার-মহারাজের ঝাড়ু-বর্দ্দারের খড়ম বানিয়ে' দিতে প্রস্তুত, প্রভুভক্তি, দেখে' স্বয়ং তার সহধর্ম্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্য্যন্ত—

সর্দ্দার

তার নাম বড়ো খাতায় উঠেছে।

মোড়ল

যাক্, সার্থক হ'লো এত-কালের সেবা। খবরটা তা'কে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কি জানি হঠাৎ—

সর্দ্দার

আচ্ছা, সে হবে, তুমি শীগ্‌গির।

মোড়ল

আর-একজন মানুষের কথা ব'ল্‌বার আছে—সে যদি-চ আমার

আপন শ্যালা, তার মা ম'রে গেলে আমার স্ত্রী তা'কে নিজের হাতে মানুষ ক'রেছে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দ্দার

তা'র কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে' চ'লে যাও।

মোড়ল

মেজো সর্দ্দার বাহাদুর ঐ আস্‌ছেন। ওঁকে আমার হ'য়ে দুটো কথা ব'ল্‌বেন। আমার 'পরে ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে ৬৯ ঙর যখন যাওয়া-আসা ছিলো, তখনি সে আমার নামে—

সর্দ্দার

না, না, কোনো দিন তোমার নাম ক'র্‌তেও তা'কে শুনিনি।

মোড়ল

সেই তো ওর চালাকি। যে-মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই তো তা'কে মার্‌তে হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ঐ রোগটি আছে আমাদের তেত্রিশের। তার তো দেখি আর কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাস-মহলে যাওয়া-আসা চ'ল্‌ছেই। ভয় হয়, কার নামে কি বানিয়ে' ব'সে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দ্দার

আজ আর সময় নেই, শীগ্‌গির যাও।

মোড়ল

তবে প্রণাম হই। [ফিরে এসে] একটি কথা। ও-পাড়ার অষ্টআশি সেদিন মাত্র তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুক্‌লো, দুটো বছর না যেতেই উপরি-পাওনা ধ'রে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার-দেড়হাজার তো হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা, স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখে'ই—

সর্দ্দার

আচ্ছা, আচ্ছা, সে-কথা কাল হবে।

মোড়ল

আমার তো দয়াধর্ম্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলিনে; কিন্তু তা'কে খাতাঞ্চি-খানায় রাখাটা ভালো হ'চ্ছে কি না, ভেবে দেখ্‌বেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়ী-নক্ষত্র জানে। তা'কে ডাকিয়ে নিয়ে—

সর্দ্দার

আজই ডাকাবো, তুমি যাও।

মোড়ল

প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হ'য়ে উঠেছে। প্রণাম ক'র্‌তে এসেছিলো, তিন দিন হাঁটাহাঁটি ক'রে, দর্শন না পেয়ে ফিরে' গেছে। বড়োই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূ-মাতা নিজের হাতে তৈরী ছাঁচি কুম্‌ড়োর—

সর্দ্দার

আচ্ছা, পরশু আস্‌তে ব'লো, দেখা মিল্‌বে।

[মোড়লের প্রস্থান

[মেজো সর্দ্দারের প্রবেশ]

মেজো সর্দ্দার

নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা ক'রে দিয়ে এলুম্।

সর্দ্দার

আর রঞ্জনের সেটা কতো দূর—

মেজো সর্দ্দার

এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দ্দার নিজে পছন্দ ক'রে ভার নিয়েছে। এতোক্ষণে তার—

সর্দ্দার

রাজা কি—

মেজো সর্দ্দার

রাজা নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারেন নি। দশ জনের সঙ্গে মিশিয়ে তা'কে—কিন্তু রাজাকে এ-রকম ঠকানো আমি তো কর্ত্তব্য মনে করিনে।

সর্দ্দার

রাজার প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ঐ মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দ্দার

না, না, এ-সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে-মোড়লের উপর ভার দেওয়া হ'য়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনো-রকম নোংরামি-কেই ভয় করে না।

সর্দ্দার

কেনারাম গোঁসাই কি জানে রঞ্জনের কথা?

মেজো সর্দ্দার

আন্দাজে সবই জানে, পষ্ট জান্‌তে চায় না।

সর্দ্দার

কেন?

মেজো সর্দ্দার

পাছে "জানিনে" এই কথা ব'ল্‌বার পথ বন্ধ হ'য়ে যায়।

সর্দ্দার

হ'লোই বা!

মেজো সর্দ্দার

বুঝ্‌ছো না? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দ্দারের

চেহারা। কিন্তু ওর যে এক-পিঠে গোঁসাই, আরেক-পিঠে সর্দ্দার। নামাবলীটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হ'য়ে পড়ে। তাই সর্দ্দারী-ধর্ম্মটা নিজের অগোচরে পালন ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে নামজপের বেলায় খুব বেশী বাধে না।

সর্দ্দার

নামজপটা না হয় ছেড়েই দিতো।

মেজো সর্দ্দার

কিন্তু এদিকে যে ওর মনটা ধর্ম্মভীরু, রক্তটা যাই হোক্। তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারী ক'র্‌তে পার্‌লে ও সুস্থ থাকে। ও আছে ব'লেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা প'ড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাতো না।

সর্দ্দার

মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারীর রক্তের মিল হয়নি।

মেজো সর্দ্দার

রক্ত শুকিয়ে' এলেই বালাই থাক্‌বে না, এখনো সে-আশা আছে। কিন্তু আজো তোমার ঐ তিনশো-একুশকে সইতে পারিনে। যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে, তা'কে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ্ ব'লে বুকে জড়িয়ে' ধ'র্‌তে হয়, তখন কোনো তীর্থ-জলে স্নান ক'রে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।—ঐ যে নন্দিনী আস্‌ছে।

সর্দ্দার

চ'লে এসো, মেজো সর্দ্দার!

মেজো সর্দ্দার

কেন? ভয় কিসের?

সর্দ্দার

তোমাকে বিশ্বাস করিনে. আমি জানি তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দ্দার

কিন্তু তুমি জানো না, যে তোমার চোখেও কর্ত্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ্ কিছু যেন মিশেছে, তা'তেই রক্তিমা এতোটা ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌লো।

সর্দ্দার

তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চ'লে এসো আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ।

নন্দিনী

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিঁদূরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। ঐ কি আমাদের মিলনের রঙ্? আমার সিঁদূর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে!

[জান্‌লায় ঘা দিয়ে]

শোনো, শোনো, শোনো। দিন-রাত এখানে প'ড়ে থাক্‌বো, যতোক্ষণ না শোনো।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ।

গোঁসাই

ঠেল্‌ছো কা'কে?

নন্দিনী

তোমাদের যে-অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তা'কে।

গোঁসাই

হরি, হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন, তখন তার ছোটো-

মুখে বড়ো-কথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী

তা'তে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই

এসো আমার ঠাকুর-ঘরে, তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী

শুধু নাম নিয়ে ক'র্‌বো কি?

গোঁসাই

মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী

শান্তি যদি পাই, তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে! আমি এই দরজায় অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাক্‌বো।

গোঁসাই

দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশী?

নন্দিনী

তোমাদের ঐ ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনো দিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাক্‌বে? যাও যাও, যাও! মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে' নিয়ে তা'কে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।

[গোঁসাইয়ের প্রস্থান

[ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ]

ফাগুলাল

বিশু তোমার সঙ্গে এলো, সে এখন কোথায়? সত্য ক'রে বলো।

নন্দিনী

তা'কে বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা

রাক্ষসী, তুই তা'কে ধরিয়ে' দিয়েছিস্! তুই ওদের চর।

নন্দিনী

কোন্ মুখে এমন কথা ব'ল্‌তে পার্‌লে?

চন্দ্রা

নইলে এখানে তোর কি কাজ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে' ভুলিয়ে' ঘুরে বেড়াস্!

ফাগুলাল

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস ক'রে এসেছি। মনে মনে তোমাকে—সে-কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমন-তরো ঠেক্‌ছে যে!

নন্দিনী

হবে, তা হবে! আমার সঙ্গে এসেই বিপদে প'ড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাক্‌তো, সে-কথা নিজেই ব'ল্‌লে।

চন্দ্রা

তবে কেন আন্‌লি ওকে ভুলিয়ে'? সর্ব্বনাশী!

নন্দিনী

ও যে ব'ল্‌লে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা

ভালো মুক্তি দিয়েছিস্ ওকে!

নন্দিনী

আমি তো ওর সব কথা বুঝ্‌তে পারিনে চন্দ্রা। ও কেন আমাকে ব'ল্‌লে, বিপদের তলায় তলিয়ে' গিয়ে তবে মুক্তি?

ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে-মানুষ, আমি তা'কে বাঁচাবো কি ক'রে ?

চন্দ্রা

ও-সব কথা বুঝিনে। ওকে ফিরিয়ে' যদি না আন্‌তে পারিস্ ম'র্‌বি, ম'রবি ! তোর ঐ সুন্দরপানা মুখখানা দেখে' আমি ভুলিনে।

ফাগুলাল

চন্দ্রা, মিছে বকাবকি ক'রে কি হবে ? কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে' আনি। বন্দী-শালা চুর-মার ক'রে ভাঙ্‌বো।

নন্দিনী

আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল

কি ক'র্‌তে যাবে ?

নন্দিনী

ভাঙ্‌তে যাবো।

চন্দ্রা

ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছো, মায়াবিনী ! আর কাজ নেই।

[গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল

সবার আগে ঐ ডাইনীকে পুড়িয়ে' মার্‌তে হ'বে।

চন্দ্রা

মার্‌বে ? তা'তে ওর শাস্তি হবে না। যে-রূপ নিয়ে ও সর্ব্বনাশ করে, সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে'। ক্ষুর্‌পো দিয়ে যেমন ক'রে ঘাস নিড়োয়, তেম্‌নি ক'রে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে'।

গোকুল

তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগুলাল

খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি, তা হ'লে—

নন্দিনী

ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে তাই আমাকে মার্‌তে চায়। আমি ওর মার্‌কে ভয় করিনে। কি ক'র্‌তে পারে করুক্ কাপুরুষ!

গোকুল

ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয়নি! সর্দ্দারকেই তুমি শত্রু ব'লে জানো! তা হোক্, যে-শত্রু সহজ শত্রু, তা'কে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী

সর্দ্দারকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যে-রকম! যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা ক'র্‌তে পারে?

ফাগুলাল

গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে।

[ফাগুলাল, চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

[একদল লোকের প্রবেশ]

নন্দিনী

ওগো, কোথায় চ'লেছো তোমরা?

১

ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চ'লেছি!

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেছো?

২

তা'কে পাঁচ দিন আগে একবার দেখেছিলুম্, আর দেখিনি। ঐ ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয় তো ব'ল্‌তে পার্‌বে।

নন্দিনী

ওরা কা'রা?

৩

ওরা সর্দ্দারদের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে।

[এই দলের প্রস্থান

[অন্য দলের প্রবেশ]

নন্দিনী

ওগো লাল-টুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছো?

১

সেদিন রাতে শম্ভু-মোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী

এখন কোথায় আছে সে?

২

ঐ যে সর্দ্দারণীদের ভোজে সাজ নিয়ে চ'লে'ছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুন্‌তে পায়, যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

[এই দলের প্রস্থান

[অন্য দলের প্রবেশ]

নন্দিনী

ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জানো?

১

চুপ্, চুপ্!

নন্দিনী

তোমরা নিশ্চয় জানো, আমাকে ব'ল্‌তেই হবে।

২

আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে' মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি। ঐ যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আস্‌ছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো।

[এই দলের প্রস্থান

[অন্য দলের প্রবেশ]

নন্দিনী

ওগো, একটু থামো, ব'লে যাও বঞ্জন কোথায়?

১

শোনো বলি, লগ্ন হ'য়ে এসেছে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা শুরুটা জানি, শেষটা জানিনে।

[প্রস্থান

নন্দিনী

[জান্‌লায় ঘা দিয়ে]

সময় হ'য়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে

আবার এসেছো অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী

অপেক্ষা ক'র্‌বার সময় নেই, শুন্‌তেই হবে আমার কথা।

নেপথ্যে

কি ব'ল্‌বার আছে বাইরে থেকে ব'লে চ'লে যাও।

নন্দিনী

বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে

আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত ক'রো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখনি যাও!

নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে' গেছে। অমন ক'রে তাড়াতে পার্‌বে না। মরি সে-ও ভালো, দরজা না খুলিয়ে' ন'ড়্‌বো না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দ্দারকে ব'লে দিয়েছি, এখনি তা'কে এনে দেবে! পূজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে' থেকো না। বিপদ্ ঘ'টবে।

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই, পূজোর জন্যে যুগ-যুগান্তর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে! তার সময় অল্প।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে' আস্‌বো। আমাকে দুর্ব্বল ক'রো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে' যাবে।

নন্দিনী

বুকের উপর দিয়ে চাকা চ'লে যাক্, ন'ড়্‌বো না।

নেপথ্যে

নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছো, তাই ভয় করো না। আজ ভয় ক'র্‌তেই হবে।

নন্দিনী

আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে' বেড়াও, আমাকেও তেম্‌নি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে

ঘৃণা করো ? স্পর্দ্ধা চূর্ণ ক'র্‌বো। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী

পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। [দ্বার উদ্‌ঘাটন] ও কি ! ঐ কে প'ড়ে ? রঞ্জনের মতো দেখ্‌ছি যেন।

রাজা

কি ব'ল্‌লে ? রঞ্জন ? কখনই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী

হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

রাজা

ও কেন ব'ল্‌লে না ওর নাম ? কেন এমন স্পর্দ্ধা ক'রে এলো ?

নন্দিনী

জাগো, রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন ?

রাজা

ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্ব্বনাশ ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মান্‌ছে না ! ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তা'কে।

নন্দিনী

রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে' দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও !

রাজা

আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও! আমি সইতে পার্‌ছিনে। কেন এমন সর্ব্বনাশ ক'রলে?

রাজা

আমি যৌবনকে মেরেছি—এতোদিন ধ'রে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী

ও কি আমার নাম বলেনি?

রাজা

এমন ক'রে ব'লেছিলো, সে আমি সইতে পারিনি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো।

নন্দিনী

(রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখীর পালখ এই পরিয়ে' দিলুম্ তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হ'তে শুরু হ'য়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি। আহা, এই যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরী! তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিলো। সে কোথায় গেলো! রাজা, কোথায় সেই বালক?

রাজা

কোন্ বালক?

নন্দিনী

যে-বালক এই ফুলের মঞ্জরী রঞ্জনকে এনে দিয়েছিলো।

রাজা

সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্দ্ধা ক'রে আমাকে আক্রমণ ক'র্‌তে এসেছিলো।

নন্দিনী

তার পরে? কি হ'লো তার? বলো, কি হ'লো? ব'ল্‌তেই হবে, চুপ্‌ ক'রে থেকো না।

রাজা

বুদ্বুদের মতো সে লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

নন্দিনী

রাজা, এইবার সময় হ'লো।

রাজা

কিসের সময়?

নন্দিনী

আমাব সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমাব সঙ্গে আমাব লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই ক'র্‌বে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্ত্তেই মেরে ফেল্‌তে পাবি।

নন্দিনী

তার পর থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার সেই মবা তোমাকে মার্‌বে। আমার অস্ত্র নেই, অ.মার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা

তা হ'লে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন।

নন্দিনী

কোথায় যাবো?

রাজা

আমার বিরুদ্ধে লড়াই ক'র্‌তে, কিন্তু আমরই হাতে হাত রেখে। বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? সেই লড়াই শুরু হ'য়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে' ফেলো ওর কেতন।

আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক্, মারুক্, সম্পূর্ণ মারুক্, তা'তেই আমার মুক্তি।

দলের লোক

মহারাজ, এ কি কাণ্ড! এ কি উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙ্লেন! আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের একদিক্ পৃথিবীকে অন্যদিক্ স্বর্গকে বিদ্ধ ক'রেছে সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পূজার দিনে কি মহাপাতক! চল্, সর্দ্দারদের খবর দিইগে।

[প্রস্থান

রাজা

এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে, নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী

যাবো আমি।

[ফাগুলালের প্রবেশ]

ফাগুলাল

বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে? এই বুঝি রাজা? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চ'ল্ছে! বিশ্বাসঘাতিনী!

রাজা

কি হ'য়েছে তোমাদের? কি ক'র্তে বেরিয়েছো?

ফাগুলাল

বন্দীশালার দরজা ভাঙ্তে, মরি তবু ফির্বো না।

রাজা

ফির্বে কেন? ভাঙার পথে আমিও চ'লেছি। ঐ তার প্রথম চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্ত্তি।

ফাগুলাল

নন্দিন, ভালো বুঝ্তে পার্ছিনে। আমরা সরল মানুষ,

দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী

ফাগু ভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ ক'রেছো, ঠ'ক্‌বার তো কিছুই বাকি রাখ্‌লে না।

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী

আমি তো সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম্, রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আন্‌তে। ঐ দেখো, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।

ফাগুলাল

সর্ব্বনাশ! ঐ কি রঞ্জন! নিঃশব্দ প'ড়ে আছে!

নন্দিনী

নিঃশব্দ নয়! মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুন্‌তে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠ্‌বে—ও কখনো ম'র্‌তে পারে না!

ফাগুলাল

হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমর! এইজন্যই কি তুমি এতোদিন অপেক্ষা ক'রেছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে?

নন্দিনী

ও আস্‌বে ব'লে অপেক্ষা ক'রেছিলুম্, ও তো এলো। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবো, ও আবার আস্‌বে। চন্দ্রা কোথায় ফাগুলাল?

ফাগুলাল

সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দ্দারের কাছে কাঁদাকাটি ক'র্‌তে।

সর্দ্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু, মহারাজ, ভুল বোঝোনি তো? আমরা তোমারই বন্দী-শালা ভাঙ্‌তে বেরিয়েছি।

রাজা

হাঁ, আমারই বন্দীশালা। তোমাতে-আমাতে দু'জনে মিলে' কাজ ক'র্‌তে হবে। এক্‌লা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দ্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আস্‌বে।

রাজা

তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল

সৈন্যেরা তো তোমাকে মান্‌বে না।

রাজা

এক্‌লা ল'ড়্‌বো, সঙ্গে তোমরা আছো।

ফাগুলাল

জিত্‌তে পার্‌বে?

রাজা

ম'র্‌তে তো পার্‌বো! এতোদিনে ম'র্‌বার অর্থ দেখ্‌তে পেয়েছি —বেঁচেছি।

ফাগুলাল

রাজা, শুন্‌তে পাচ্ছো গর্জ্জন?

রাজা

ঐ যে দেখ্‌ছি, সর্দ্দার সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে। এতো শীগ্‌গির কি ক'রে সম্ভব হ'লো? আগে থাক্‌তেই প্রস্তুত ছিলো, কেবল আমিই জান্‌তে পারিনি। ঠকিয়েছে আমাকে! আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

ফাগুলাল

আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছলো না।

রাজা

সর্দ্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে' রেখেছে। আর তা'রা পৌঁছবে না।

নন্দিনী

মনে ছিলো বিশু পাগলকে তা'রা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না?

রাজা

উপায় নেই। পথঘাট আটক ক'র্‌তে সর্দ্দারের মতো কাউকে দেখিনি।

ফাগুলাল

তা হ'লে চলো, নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ্ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দ্দার তোমাকে দেখ্‌লে রক্ষা থাক্‌বে না।

নন্দিনী

একা আমাকেই নিরাপদের নির্ব্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দ্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে' দিলে। সর্দ্দার, সর্দ্দার! দেখো, ওর বর্ষার আগে আমার কুন্দ-ফুলের মালা দুলিয়েছে। ঐ মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ্ ক'রে দিয়ে যাবো। সর্দ্দার! আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে। জয় রঞ্জনের জয়!

[দ্রুত প্রস্থান

রাজা

নন্দিনী!

[প্রস্থান

[অধ্যাপকের প্রবেশ]

ফাগুলাল

কোথায় ছুটেছো অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

কে যে ব'ল্‌লে—রাজা এতোদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে—পুঁথি পত্র ফেলে' সঙ্গ নিতে এলুম্।

ফাগুলাল

রাজা তো ঐ গেলো ম'র্‌তে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক

তাব জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায় ?

ফাগুলাল

সে গেছে সবার্ আগে। তা'কে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক

এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পার্‌বে না, তা'কে ধ'র্‌বো।

[প্রস্থান

[বিশুর প্রবেশ]

বিশু

ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায় ?

ফাগুলাল

তুমি কি ক'রে এলে ?

বিশু

চ'লেছে ল'ড়্‌তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজ্‌তে এলুম্। সে কোথায় ?

ফাগুলাল

সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে'।

বিশু

কোথায় ?

ফাগুলাল

শেষ মুক্তিতে। বিশু, দেখ্‌তে পাচ্ছো ওখানে কে শুয়ে আছে ?

বিশু

ও যে রঞ্জন !

ফাগুলাল

ধূলায় দেখ্‌ছো ঐ রক্তের রেখা ?

বিশু

বুঝেছি, ঐ তাদের পরম মিলনের রক্তরাখী ! এবার আমার সময় এলো এক্‌লা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুন্‌তে চাইবে আমার পাগ্‌লী ! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্‌ !

ফাগুলাল

নন্দিনীর জয় !

বিশু

নন্দিনীর জয় !

ফাগুলাল

আর ঐ দেখো ধূলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডানহাত থেকে কখন্ খ'সে প'ড়েছে ! তার হাতখানি আজ সে রিক্ত ক'রে দিয়ে চ'লে গেলো।

বিশু

তাঁকে ব'লেছিলুম্, তার হাত থেকে কিছু নেবো না। এই নিতে হ'লো, তার শেষদান।

[প্রস্থান

[দূরে গান]

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চ'লে,
আয়, আয়, আয়।
ধুলার আঁচল ভ'রেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায়, হায়, হায়।

IMPERIAL LIBRARY